দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

১১ জুলাই - ২০১১, ২৬ আষাঢ় - ১৪১৮ ।। ৬৩ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা

লোকপাল বিলের ভবিষ্যং কি ?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

মমতা না চাইলেও প্রতিদিনই খুন হচ্ছে এরাজ্যে ❑

ভ্রান্ত আদর্শের জন্যই বামপন্থীরা নিঃশেষ হচ্ছে ❑

রামদেব অনশনে বসতেই কংগ্রেস এতটা উগ্র হয়ে উঠল কেন? ❑ সাধন কুমার পাল ❑

দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে সিদ্ধহস্ত ইউ পি এ- ২ সরকার ❑ জয় দুবাসী ❑

দুর্নীতির পঙ্কোদ্ধারে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোকপাল বিল ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑

লোকপাল বিলে প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করতে কংগ্রেসের এত আপত্তি কেন? ❑ তারক সাহা ❑

রামদেব ও আন্না হাজারের আন্দোলন : বাস্তবে কি উঠে এল ❑ অমলেশ মিশ্র ❑

অসম বিধানসভার নির্বাচনী ফল : এক অশনি সংকেত ❑ বাসুদেব পাল ❑

সরকারি প্রশ্রয়ে ডাক্তারী আসন বেচে কেরলে কোটি কোটি টাকার মুনাফা চার্চ কাউন্সিলের ❑

গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য এবং শিষ্য ও আচার্যের ভূমিকা ❑ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ❑

শ্রীগুরুপূর্ণিমা ও আর এস এস ❑ বাসুদেব পাল ❑

হায় ফিদা হোসেন, হায় ফিদা হোসেন! ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑

বার্সিলোনাই কি সর্বকালের সেরা ক্লাব দল? ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের শততম অধিবেশন জেনিভায় ❑ প্রিয়ব্রত দত্ত ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮** ❑

অন্যরকম : ২৯ ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ২৬ আষাঢ়, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১১ জুলাই - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

লোকপাল বিলের ভবিষ্যৎ কি?

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT <u>PREPAYMENT</u>

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আন্নাদের ঠেকাতে প্রণববাবুদের এত উদ্যোগ কেন?

সম্প্রতি কলকাতায় দলীয় এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলিয়াছেন, রামদেব আন্নাদের ঠেকাইতে হইবে। তাঁহারা নাকি গণতন্ত্রের উপর আঘাত করিতেছেন। এখন প্রশ্ন, রামদেব আন্নাদের দাবিগুলিকে ঠেকাইতে প্রণববাবুদের এত উদ্যোগ কেন? ভ্রষ্টাচার অনুসন্ধান আর আইনি ব্যবস্থা সম্পাদনের দায়িত্ব সরকারের নিকট হইতে বিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা লইয়া বিশ্বের নানা দেশে ভাবনাচিন্তা শুরু হইয়াছে ষাটের দশকে। ইউরোপের কিছু দেশে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এমন কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন সাংবিধানিক সংস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহারা দুর্নীতি অনুসন্ধান করিবে। আমাদের দেশে ১৯৬৯ সালে প্রথম লোকসভায় লোকপাল প্রস্তাব অনুমোদন করা হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্যসভা সেই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। ১৯৭১ হইতে ২০০৮ পর্যন্ত নয়বার বিভিন্ন সরকার এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল কিন্তু তাহা অনুমোদিত হয় নাই। আজ প্রণব মুখার্জী বড় মুখ করিয়া বলিতেছেন—সংসদের প্রতিনিধিদের চ্যালেঞ্জ করিতেছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরিয়া যে প্রস্তাব সংসদের অনুমতির অপেক্ষায় রহিয়াছে এবং আজও টালবাহানা করিতেছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট যে দলমত নির্বিশেষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজ অপকর্ম ঢাকিতে এই আইন প্রণয়নের বিরোধী। রামদেব বা আন্না হাজারে নন, দেশের সামনে এখন বড় প্রশ্ন দুর্নীতি। আর ইউপিএ সরকার এই প্রশ্নটিকেই দূরে নিক্ষেপ করিতে আগ্রহী। আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের পক্ষে একাজ করা সম্ভব। কারণ এই দলের এবং সরকারের অনেক রাঘববোয়ালই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। বোফর্স কেলেঙ্কারিতে কীভাবে ঘুষের টাকা আর দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়নি তার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। ইহা চিন্তা করিয়া আতঙ্কিত হইতে হয় যে টেলিকমমন্ত্রী এ. রাজার দুর্নীতির বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী পুরোটাই জানিতেন। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী দয়ানিধি মারানকে জড়াইয়া সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারির ঘটনাও তাঁহার অজানা থাকিবার কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন তিনি লোকপালের নিকট পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, তবু কংগ্রেস দলের সমস্যা হইতেছে। বর্তমান ইউপিএ সরকার এত দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে জড়িত যে এখন আর কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পদটি লোকপালের আওতায় রাখিবার সাহস পাইতেছে না। অথচ ২০০১ সালে এই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রধানমন্ত্রী পদটি লোকপালের আওতাভুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছিল। আসলে লোকপাল প্রশ্নে আজ সরকারের দ্বিচারিতা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোনও অবস্থাতেই প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার অধিকার লোকপালের থাকুক তাহা সরকার চাহিতেছে না। বিচার বিভাগকেও লোকপালের আওতায় আনিতে আপত্তি রহিয়াছে সরকারের। কোনও সাংসদ যদি হাতেনাতে ধরাও পড়েন তাহা হইলেও তাহাদের লোকপালের হাতে তুলিয়া দিতে সময় নাই সরকারের। লোকপালকে নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও সরকার নিজের হাতে রাখিতে চায়। সর্বদলীয় বৈঠকে পেশ করা সরকারের মন্ত্রিগোষ্ঠীর লোকপাল বিলের খসড়াকে জোকপাল-এর চেয়েও নিকৃষ্ট বলিয়া দেশের প্রধান বিরোধীদল মন্তব্য করিয়াছে।

আজ দেশের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান দুইটি সংস্থা নানা কারণে দুর্বল। সিভিসি নখদন্তহীন, সিবিআই নিরপেক্ষ নয় আর এইরকম স্থান হইতেই উঠিয়া আসিয়াছে শক্তিশালী লোকপাল প্রতিষ্ঠানের দাবি। আন্না হাজারে, কিরণ বেদীরা যে জনলোকপাল বিলের কথা বলিতেছেন যেখানে সিভিসি এবং সি বি আই এবং দুর্নীতি দমন শাখাকে লোকপালের আওতায় আনার দাবি রহিয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট এবং নির্বাচন কমিশনের মতো লোকপালকে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাশাপাশি লোকপালের হাতে ফৌজদারি ক্ষমতাও অর্পণ করিতে হইবে যাহাতে তদন্তের স্বার্থে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়। এসব হইলে কংগ্রেসের করেকম্মে খাওয়া নেতাদের চলিবে কেমন করিয়া, তাই আন্নাদের ঠেকাইতে প্রণববাবুদের এত উদ্যোগ। গত ৪০ বছরে যাহা হয় নাই, এইবারে তাহা হইয়াছে। এখানেই সভ্য সমাজ-এর সার্থকতা। তবে লোকপাল আইন যদি পাশও হয় সেটাও কিন্তু একেবারে প্রথম সোপান। আসল লড়াই অনেক ব্যাপক। সেখানে আপনি-আমি সবাইকেই থাকিতে হইবে। আর আমাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য রামদেব, আন্না হাজারে, কিরণ বেদীদের অবশ্যই চাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

দেশের জন্য মরতে চাই না, বাঁচতে চাই। দেশের জন্য অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন। আমি কিন্তু দেশের জন্য কাজ করতে চাই। এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা। শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করতে চাই। কাজ করতে করতে রাস্তায় পড়ে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় এবং সেই শবদেহটা যদি কুকুরে টেনে নিয়ে যায়, তাহলেও কোনও ক্ষোভ নেই।

—একনাথ রানাডে

ধনী ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়লেও বিশাল সংখ্যক এখনও বেকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশ্বের প্রথম কুড়িজন ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় ক্রমাগত ভারতীয়রা ঢুকে পড়ছেন। প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা এক এক করে বাড়ছে। অথচ ভারতে বিরাট সংখ্যক বেকার, প্রচ্ছন্ন বেকারদের সংখ্যাও যে পাল্লা দিয়ে বছর বছর কোটিতে বাড়ছে, সেদিকে বোধহয় সবার দৃষ্টি নেই। এছাড়া যারা ছোটখাটো কাজ করছেন তাদের মজুরিও বিশ্বে স্বীকৃত নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি থেকে অনেক কম। অদক্ষ শ্রমিকদের বেলায় তা আরও কম।

ভারতের বিশাল শ্রমশক্তি রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় তিন কোটি কোনও কাজই পান না। আরও আড়াই কোটি রয়েছেন খাতায়-কলমে ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকার (Under Employed)। এসব তো রয়েছে সরকারি পরিসংখ্যানে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা

> **কৃষি থেকে জি ডি পি'র হার ক্রমাগত কমছে। অথচ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তা প্রায় একরকম ছিল। তখন কৃষি থেকেই মোট জি ডি পি'র অর্ধেকটাই আসত। এখন তা কমতে কমতে ২০০৯-১০-এ মাত্র ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে কৃষি থেকে প্রাপ্ত গড় আয় অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে কম।**

সংস্থার (এন এস এস ও) সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০৭-০৮ বছরে শ্রমশক্তি ছিল ৪১ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ৪১ কোটি ৬৬ লক্ষের মধ্যে। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যাটি হলো যাঁরা প্রতিদিন কাজের সন্ধানে বের হন, আর বেশী সংখ্যাটি হলো বছরের মধ্যে যাঁরা শ্রমশক্তি বলে গণ্য হন। এক্ষেত্রে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য— এদেরকে কোনও একটা ভিত্তিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাত্র ৮.১ শতাংশ বেকার অর্থাৎ তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক যাঁরা রোজ কাজের সন্ধানে বের হয়ে কোনও কাজই খুঁজে পান না। আসলে প্রকৃত বেকারদের সংখ্যা বা বেকারদের অবস্থাটা লুকিয়ে রাখা হয়। এখানে বেশ ধোঁয়াশা রয়েছে। ভারতে শ্রমিক-বাজারের অবস্থাটাই এরকম। এখানে রয়েছে স্বল্প বা আংশিক সময়ের কর্মী, মরসুমী শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক। এছাড়া ব্যাপক কাজের অভাব এবং কিছু সামাজিক রীতি-নীতি বা ফ্যাক্টর যার ফলে মহিলারা বেকার হওয়া সত্ত্বেও কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান না বা কাজের সন্ধানে বের হন না। অনেকে আবার দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে যান না। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে ৫০ শতাংশ পুরুষ কাজের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশই কাজ করেন। এমনকী যেসকল মেয়েরা কাজের সন্ধানে বের হন তাঁদেরও একটা বড় সংখ্যা বছরভর কাজ খুঁজে পান না।

যে আড়াই কোটি মানুষ কাজ খুঁজে পান না তাঁদের ৬৪ শতাংশই মহিলা। ব্যবস্থার অভাবে বেকার এবং ছদ্ম-বেকারদের প্রকৃত সংখ্যাটা হিসাবের আওতাতেই আসে না। আবার যাদের কাছে কাজ আছে তাদের মধ্যে ৪১.৬ শতাংশের রোজগার বৈশ্বিক দারিদ্র্যসীমার বা ন্যূনতম রোজগারের (১.২৫ ডলার) অনেক কম। দিন-আনা দিন-খাওয়ার ক্রয়ক্ষমতাও নেই।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যারা কর্মরত তাদের বেশিরভাগই গরীব। গ্রামীণ ভারতের অর্ধেক কর্মরতরা এই প্রকল্পের অধীন। এই গ্রামীণদের ৫৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৫৮ শতাংশ মহিলা। শহরে এই হারটা ৪৩ শতাংশ পুরুষ এবং ৪২ শতাংশ মহিলা।

এখানে প্রামাণ্য পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। ভারতে যাঁদের মাসিক মাথাপিছু ভোগ্যপণ্য ব্যবহার বা ক্রয়ক্ষমতা বেশি তাঁদের প্রায় সবাই সরকারি মাস মাইনে পান এবং শহরে বসবাসকারী। কর্ম বিনিয়োগের দুরবস্থা এবং আয়ের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের অনেক কারণ রয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগই কম সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্র থেকে অন্যত্র কাজ করতে যাওয়ার সংখ্যাটা বেশ কম। রয়েছে দক্ষ শ্রমিকের অভাব।

প্রতি বছর কৃষি থেকে জি ডি পি'র হার ক্রমাগত কমছে। অথচ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তা প্রায় একরকম ছিল। তখন কৃষি থেকেই মোট জি ডি পি'র অর্ধেকটাই আসত। এখন তা কমতে কমতে ২০০৯-১০-এ মাত্র ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে কৃষি থেকে প্রাপ্ত গড় আয় অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে কম। কৃষিতে ব্যক্তি-প্রতি বর্ধিত আয়ের মূল্য অনেক কম।

ক্ষেত্র অনুসারে কর্মবিনিয়োগ ও বর্ধিত আয় (Value Added)

ক্ষেত্র	কর্মবিনিয়োগ মোট সংখ্যার শতাংশ				ভ্যালু এডেড (প্রতিব্যক্তি)
	১৯৮৩	—	২০০৬-০৭	—	২০০৪-০৫
কৃষি	৬৬.৪২	—	৫০.১৯	—	২০,৯৩৭
খনি এবং...	০.৬৬	—	০.৬১	—	১,৭০,৮০১
ম্যানুফাকচারিং	১১.২৭	—	১৩.৩	—	৩৫৫,৩১৮
বিদ্যুৎ ও অন্য	০.৩৪	—	০.৩৩	—	২২৮,৬৫০
নির্মাণ শিল্প	২.৫৬	—	৬.১	—	৫৯,১৯৩
পরিবহণ	২.৮৮	—	৫.০৬	—	১১০,৪০৩
ব্যবসা ও হোটেল	৬.৯৮	—	১৩.১৮	—	৭৫.০৮০
বাণিজ্য	২.৭৮	—	২.২২	—	২৪৫,৮৩৬
অন্যান্য ক্ষেত্র	৯.১	—	৮.৯৭১	—	৩০,০৯৫

সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখে ওমর-সরকারের জঙ্গি পুনর্বাসন নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি-প্রশিক্ষিত কাশ্মীরী যুবকদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে ওমর সরকারের সিদ্ধান্তটি। গত ১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে এই সিদ্ধান্তটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে পিটিশন ফাইল করে জম্মু-কাশ্মীর প্যান্থার্স পার্টি। তাদের অভিযোগ— এর ফলে জম্মু-কাশ্মীর সহ সারা দেশেই জঙ্গি সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে।

প্যান্থার্স পার্টির নেতা ভীম সিং, বিচারপতি পি সত্যশিবম্ ও এ কে পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে এনিয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বলেন—জম্মু-কাশ্মীর সরকারের এই পুনর্বাসন প্রকল্প অদূর ভবিষ্যতে দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে বিপজ্জনক হতে চলেছে এবং রাজ্যে অচিরেই তা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। কারণ আল-কায়দার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাশ্মীরী যুবকদের জন্যই এই পুনর্বাসন প্রকল্পের আয়োজন।

গত ১ জুলাই শুক্রবার এই আবেদন শুনে বিচারপতিরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে অতি দ্রুত ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করেন। শ্রী সিং আরও বলেন, ‘‘জম্মু-কাশ্মীর সরকার এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম ব্যাচ হিসেবে ২৮ জন জঙ্গিকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুত। কিন্তু এটাও মাথায় রাখা দরকার যে ২৮ জন যুবককে তারা পুনর্বাসন দিচ্ছে তারা একদা ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, তাই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইলেও সেটা জঙ্গিদের ভারত-বিরোধী পরিকল্পনার একটা অঙ্গও হতে পারে।’’

শ্রী সিংয়ের এই অভিযোগের সারবত্তা অস্বীকার করতে পারছেন না কেউই। কারণ গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা মন্তব্য করেছিলেন, সরকার পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অন্তত ৭০০ জন যুবক জঙ্গি দরখাস্ত করেছে যে তারা হিংসা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আগ্রহী। এছাড়াও ওরকমের ‘প্রাক্তন জঙ্গি’ আরও ১২৫ জনের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আবেদনের দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। সরাসরি জঙ্গি ক্যাম্প থেকে শ’য়ে শ’য়ে জঙ্গি যুবকের আচমকা শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়েছে। এতটা আশা করছেন না কেউই। মোটামুটি জঙ্গিদের ভারত-বিরোধী চক্রান্তের নবতর পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনা কার্যকর করতে মৌলবাদী ওমর আবদুল্লা সরকারের প্রয়াস হিসেবেই এটাকে দেখা হচ্ছে।

গত বছর কেন্দ্র পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি ও অস্ত্র-প্রশিক্ষণ নিতে যে এদেশীয় তরুণরা গিয়েছিল তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে রাজ্য- সরকারের নীতিকে সমর্থন করেছিল। এখন মৌলবাদীদের চাপে পড়ে আরও একধাপ এগিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত জঙ্গিদেরও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঘরে ফেরানোর কথা বলছে কেন্দ্রীয় সরকার! এই সুবর্ণ সুযোগ নিতে দেরী না করে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি-প্রশিক্ষণরত প্রায় ১৩০০ যুবকের মধ্যে অধিকাংশ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। জনৈক সেনা-কর্তার মন্তব্য— ‘ওদের ‘স্বাভাবিক জীবন’ আবার অস্বাভাবিক করে তুলবে জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি।’

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারে নামছে ভি এইচ পি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খুব শীঘ্রই দেশজুড়ে প্রচার অভিযানে নামছে। এই প্রচার অভিযানে বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি ও ‘কালো টাকা’ দেশে ফেরৎ আনার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। সম্প্রতি এলাহাবাদে পাঁচদিন ব্যাপী প্রমুখ কার্যকর্তাদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ৪ জুন গভীর রাত্রে অনশনরত বাবা রামদেব ও তাঁর শিষ্য সমর্থকদের উপর বর্বর পুলিশী অভিযানের বিষয়টি সরাসরি হিন্দু সাধু-সন্তদের উপর শাসক দলের চূড়ান্ত আক্রমণ বলেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মনে করে। এছাড়াও, সংসদে কেন্দ্র সরকার যে, ‘প্রিভেনশন অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স’ বিল আনতে চলেছে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে। কেননা এই বিলে মূলত হিন্দুদেরকেই নিশানা করে খসড়া তৈরি হয়েছে বলেই খবর। তবে সবমিলিয়ে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা পরিষদ যাই বলুক, পরিষদের আসল টার্গেট ‘ইউপিএ’ সরকারের চেয়ারপার্সন ও অন্তরাত্মা সোনিয়া গান্ধী স্বয়ং। এই জনজাগরণ ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রচার যদি আগামী সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বক্তব্য, বাবা রামদেবের সঙ্গে তথাকথিত ‘সঙ্ঘ পরিবারে’র কোনও সম্পর্কই নেই। যুক্তি-তথ্য দিয়ে অভিযোগের জবাব দিতে না পেরেই কংগ্রেসী পেটোয়ারা ওই ভুয়ো গল্প ফেঁদেছে। বাবা রামদেবের বক্তব্যের সঙ্গে পরিষদের কোনও দ্বিমত নেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার দাবীকে সমর্থন করে। কিন্তু তার আন্দোলনকে পরিচালনা করে না। যদিও পরিষদের প্রচারের মূল লক্ষ্যই হলো ২০১৪-তে কেন্দ্রে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের পরিবর্তন।

বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন সভাপতি অশোক সিংহল। এছাড়া ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া, এস বেদান্তম্ এবং বরিষ্ঠ আর এস এস প্রচারক মধুভাই কুলকার্নি উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য রাজনীতি

ভ্রান্ত আদর্শের জন্যই বামপন্থীরা নিঃশেষ হচ্ছে

নিশাকর সোম

সমগ্র দেশে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে। এই ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি'র দাওয়াই হলো 'রাজ্য ভ্যাটসহ কর' তুলে নিয়ে দাম কমাক। এ-রাজ্যে রান্নার গ্যাসের মূল্য ৩৪ টাকা (১৬ টাকা ছাড় দেওয়ার পর) বেড়েছে, ডিজেলের দামও বেড়েছে। ট্যাক্সি-মিনিবাস মালিকরা ভাড়া বাড়ানোর দাবি তুলেছে। রাজ্যের বামপন্থীরা আত্মরক্ষামূলক ভাবে রাজ্য-সরকারের ১৬ টাকা ছাড়কে 'অভিনন্দন' জানিয়েছে। এদিকে ত্রিপুরা রাজ্যে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার বন্ধ প্রতিপালিত হয়েছে। এ-রাজ্যের সিপিএম তো জনগণের দাবি নিয়ে আন্দোলন না করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই জনগণও ভোটে সিপিএমকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

নির্বাচনী বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বামফ্রন্টের আর এক শরিক সিপিআই-এর দু'দিনের রাজ্য পরিষদের সভা হয়েছে। সভায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন উপস্থিত ছিলেন। এই সকল পরিষদ সদস্য এই বিপর্যয়ের জন্য সিপিএমকে দায়ী করেছে। এই আলোচনা থেকে যে বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে---(১) বুদ্ধদেব-বিমান বসু ব্যর্থ। বুদ্ধদেববাবু উদ্ধত— বিমানবাবু স্বৈরতান্ত্রিকভাবে শরিকদের কথা শোনেননি। বুদ্ধবাবু মন্ত্রিসভার সদস্যদের কিছুই পাত্তা দিতেন না। (২) সিপিএমের নিচের তলার কর্মীরাও বুদ্ধ-বিমানের মতোই অহংকারী ও উদ্ধত এবং মারমুখী। (৩) সিপিএমের সঙ্গে থেকেই সিপিআই-এর বিপর্যয়।

এরপরেও কি মনে হচ্ছে— সিপিএম-সিপিআই মিলবে? না, সেটা সুদূরপরাহত।

সিপিআই-এর রাজ্য পরিষদে প্রতিটি জেলার সম্পাদক বিভিন্ন ঘটনা তুলে বলেছেন যে, সিপিএম আজকেই জেলাস্তরের বামফ্রন্ট চায় না। কাগজে কলমেই জেলা বামফ্রন্ট। রাজ্য-বামফ্রন্টের কায়দায় জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক— অবশ্যই সিপিএম-নেতা। আবার তারা নিজেরাই এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ চালায়। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে সিপিআই- নেতা-কর্মীরা সিপিএমের সঙ্গে মিলনের বিরুদ্ধে। মিলন তো দূরের কথা সিপিএমের সঙ্গে একত্রে কাজ করতেও অনীহা সিপিআই-এর। সিপিআই পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন দলমত নির্বিশেষে সকল ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে একত্রে একটি ফোরাম গঠন করেছে। এর দায়িত্বে থাকা সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় নেতা সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেছেন, ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ আন্দোলনে রাজনীতি আনা চলবে না। প্রসঙ্গত, গুরুদাস দাশগুপ্ত নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য সিপিএমকে দায়ী করে বলেছিলেন, 'সিপিএমের নিচের তলার কর্মীরা গুণ্ডামি ছাড়া কিছুই জানে না।' সিপিআই রাজ্য-কমিটিতে মত প্রকাশ হয়েছে যে সিপিআই নিজস্ব শক্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে। সিপিএমের লেজুড়বৃত্তি করবে না। বামফ্রন্টে সিপিএমের প্রতিটি প্রস্তাবের তুল্যমূল্য বিচার করে নিজস্ব মতে চলবে। সিপিআই বর্তমান বামফ্রন্ট রেখে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা দেখছে না বলে শোনা যাচ্ছে। আগামী সম্মেলন এবং পার্টি কংগ্রেসে সিপিআই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সর্বস্তরে নেতৃত্ব বদলের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বৃদ্ধ নেতাদের স্থলে নবীনদের আনার প্রচেষ্টা চালাবে। সিপিআই-এর মতো ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যেও নব-নেতৃত্ব আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। তবে এই প্রচেষ্টা ধাক্কা খেয়েছে— জয়ন্ত রায়কে পার্টি নেতৃত্বে বসানোর প্রচেষ্টায়। নরেন চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী অশোক ঘোষ-দেবব্রত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তাদের কৌশলী স্লোগান হলো— ''অশোক ঘোষ নেতৃত্ব ছাড়লে আর পার্টিতে থাকবো না।''

সিপিএম পার্টিতেও গভীর সঙ্কট। নতুন-নবীন আনো, বুড়ো হঠাও স্লোগান উঠেছে। সমস্ত জেলায় সর্বস্তরে এই আওয়াজ উঠেছে।

আদতে বামপন্থা কুপমণ্ডুক নীতির ব্যর্থতাকে নেতার ব্যর্থতা বলে আসল সমস্যা ধামা-চাপা দেওয়া হচ্ছে। কোনও একটা নীতি যখন পচে যায়— তখন সেই নীতিকে বাঁচানোর জন্যেই নেতা-কে দায়ী করা হয়, কমিউনিস্ট পার্টিতে দেখুন পিসি যোশী, বি টি রণদিভে-কে দায়ী করা হয় নীতির ব্যর্থতার।

সিপিএম এখনও পার্টি-কর্মীদের উজ্জীবিত করতে পারছে না। অপর দিকে পার্টি কর্মীরা সুশান্ত ঘোষ, অনিল বসু, লক্ষণ শেঠদের বিরুদ্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ পাঠাচ্ছে। রাজ্য-কমিটির অফিসে সাধারণ সমর্থক ও সাধারণ মানুষ যে চিঠিপত্র পাঠাচ্ছেন তাতে বুদ্ধবাবুর নিন্দাসহ সমগ্র পার্টির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এই চিঠি পড়ে বুদ্ধবাবু নাকি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন? সিপিএম-এর সর্বস্তরে নেতৃত্ব বদলের আওয়াজ উঠেছে।

এসব দেখে-শুনে-পড়ে রাজ্য- সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যদের দায়িত্ব পুনর্বন্টন-এর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে— যাতে করে পার্টি সদস্যদের আস্থা ফেরানো যায়। এর লক্ষ্য হলো আগামী পার্টি সম্মেলন থেকে পুরানোদের বাদ দিয়ে নতুনদের আনার পথ প্রশস্ত করা। এই ব্যবস্থায় রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসুর কাজের বোঝা কমানো হচ্ছে যাতে তিনি রাজ্য-সম্পাদক-এর কাজটি ঠিক মতো করতে পারেন। তাঁর হাতে একাধিক জেলার দায়িত্ব আছে। তা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যদের হাতে দেওয়া হবে। বামপন্থা না ডান-পন্থা এসব কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে ভারত পন্থা অর্থাৎ গরীব-বিত্তহীনদের স্বার্থ রক্ষা করে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের দিকে তাকানো। কার্ল মার্কস ইংলন্ডের অর্থনীতি, ফরাসী অষ্টম বুমেয়ার এবং হেগেল-এর ডায়ালেকটিকস-এর ভিত্তি করে মার্কস রচনা করেন তাঁর নীতি। তিনি বৃটিশ মিউজিয়াম ঘেঁটে তৈরি করেন তাঁর মতবাদ। তিনি রিকার্ডো, কেইনস, অ্যাডাম স্মিথ ইত্যাদি অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন যা আজকের পরিস্থিতিতে অচল। যদিও বক্তব্য সংক্ষেপ হলো— কারণ প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে কথাগুলি এলো। তথাকথিত সমস্ত কমিউনিস্টদের বিদেশী বুলি না আওড়ে দেশের পরম্পরা, ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্মীয় ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে নীতি নির্ধারণ করা দরকার। শুধু ক্ষমতা দখল করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। বিদেশী ভাবধারাকে রপ্ত করতে করতে আজ সমাজ এক অবক্ষয়ী অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

মমতা না চাইলেও প্রতিদিনই খুন হচ্ছে এরাজ্যে

গূঢ়পুরুষের কলম

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা-হানাহানি যে চলছে তা' স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন। গত ২৭ জুন তিনি রাজ্য বিধানসভায় যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন তাতে স্বীকার করা হয়েছে ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক সংঘর্ষে মোট ১৮ জন খুন হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে সিপিমের ৮ জুন কর্মী, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার ১ জন এবং তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের ৯ জন কর্মী সমর্থক। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে এখন বাদ প্রতিবাদ চলছে।

প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটছে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার নির্বাচনের প্রচার চলাকালে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের পরিবর্তন চান। বদল চান। বদলা নয়। অর্থাৎ ক্ষমতায় এলে তাঁর দল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথে যাবে না। এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন কারণ বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে বাম বিরোধী হাজার হাজার মানুষ কম্যুনিস্টদের হিংসার বলি হয়েছেন। এই রাজ্যে খুনের রাজনীতি উগ্র কম্যুনিস্ট নকশালরা আমদানি করেছিল। সেই নকশালরাই এখন 'মাওবাদী' এবং হিংসাই তাদের রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি কম্যুনিস্টরা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তারা আজও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে শ্রেণী শত্রু 'খতম' না করলে সর্বহারার সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সিপিএমের তিন দশকের বেশি সময়ের রাজত্বে গুপ্ত রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা ছিল স্বজনহারাদের পরিবারেরা ক্ষমতার পালা বদল হলে বদলা নেবে। হিংসার বদলা প্রতিহিংসা। বিশেষত যেখানে সিপিএমের খুনি বাহিনীর বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসন কোনও আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজন হারানোদের ক্ষোভ জানতেন বলেই তাঁর দলের নির্বাচনী প্রচারের স্লোগান ছিল, 'বদল চাই, বদলা নয়'।

গত ১৩ মে বিধানসভার নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই দেখা যাচ্ছে জেলায় জেলায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা প্রকাশ্যেই 'বদলা'-র পথে হাঁটছে। তৃণমূলের জোট শরিক কংগ্রেস দলের কর্মীরাও ওই একই পথে চলেছে। কলকাতায় বসে জোটের প্রধান নেত্রী যতই নিষেধ করুন না কেন রাজ্যের গ্রামগঞ্জে দলীয় কর্মীরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথ থেকে সরছেন না। বোঝাই যাচ্ছে, মমতা না চাইলেও তাঁর দলের অধিকাংশ নেতাই এখন বদলা চাইছে। ফলে প্রতিদিনই এই রাজ্যে কোথাও না কোথাও খুন হচ্ছে অথবা গণপিটুনি চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা-হানাহানি যে চলছে তা' স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন। গত ২৭ জুন তিনি রাজ্য বিধানসভায় যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন তাতে স্বীকার করা হয়েছে ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক সংঘর্ষে মোট ১৮ জন খুন হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে সিপিমের ৮ জন কর্মী, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার ১ জন এবং তৃণমূল—কংগ্রেস জোটের ৯ জন কর্মী সমর্থক। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে এখন বাদ প্রতিবাদ চলছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূলীদের হিংসায় কমপক্ষে ২০ জন সিপিএম ও আর এস পি দলের সমর্থক এই রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। দলীয় মুখপত্র গণশক্তি কাগজে মৃত ২০ জন সিপিএম কর্মী—সমর্থকদের নাম ঠিকানাও প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে নিহতদের নাম ঠিকানা এবং হত্যার ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দলের পক্ষ থেকে আগেই দেওয়া হয়। সেই বিবরণে এ' কথাও বলা হয়েছিল যে ভোটের ফল প্রকাশের একমাসের মধ্যেই এইসব দলীয় সমর্থকরা খুন হয়েছেন। তা'ছাড়া ৬২০ জন বাম সমর্থক তৃণমূল কর্মীদের হাতে মারখেয়ে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। কমপক্ষে ৬২৮টি সিপিএম পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে...ইত্যাদি।

এই বাদানুবাদের মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট যে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কর্মীদের একটা অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনছে না। তারা বদলার পথে হাঁটছে। নিঃসন্দেহে এটা অশুভ সঙ্কেত। মনে রাখতে হবে তৃণমূল দলটি জন্মলগ্ন থেকেই নেত্রী নির্ভর দল। শৃঙ্খলা পরায়ণ নীতিনিষ্ঠ দল নয়। এতকাল দলীয় আদর্শ ছিল সিপিএম হঠাও। রাজ্যে ক্ষমতা থেকে সিপিএম হঠে গেছে। এখন কর্মীরা কী করবে বা দলের আদর্শ ও লক্ষ্য কী হবে তারা জানে না। একটা রাজনৈতিক আদর্শের লক্ষ্যের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কোনও পথ নির্দেশ না থাকায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা রাজনৈতিক হিংসাকেই আদর্শ করছে। কথায় আছে, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কর্মশালা' হয়।

এই সময়

সীমান্তে দুঃসংবাদ

পেট্রো ডলারের আনুকূল্যে বনগাঁ সীমান্তে ইচ্ছামতী নদীর তীরে বহুদিন ধরেই তৈরি হয়েছে এক বিশালাকৃতি মসজিদ। যার গঠনশৈলী দেখে বিশেষজ্ঞরা তাকে দুর্ভেদ্য দুর্গ বা ওয়াচ টাওয়ার বলেছিলেন। এই মসজিদটির কারিগরেরা প্রত্যেকেই ছিল বাইরের লোক, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অপরিচিত। সাম্প্রতিককালে অভিযোগ উঠেছে মসজিদটির তলায় অনেকগুলি গুপ্ত কক্ষ মৌলবাদীদের আশ্রয় কক্ষ ও অস্ত্র কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে এখবর অজানা নয় কিন্তু পরিবর্তনের ব্রাহ্মমুহূর্তেও এ নিয়ে তদন্তে তাদের বড়ই অনীহা!

আন্তর্জাতিক মানের কলকাতা বিমান বন্দরের গায়ে যশোর রোডের পাশে বেশ কিছু বছর আগেই জন্ম নিয়েছিল এক আরবী শিক্ষা কেন্দ্র, নাম—জামাতিয়া ইসলামিয়া মদনীয়া। স্থানের নামও পাল্টে হয়েছিল মদীনা নগর। অভিযোগ এই শিক্ষাকেন্দ্রে জেহাদী শিক্ষার পাঠ নিচ্ছে কম করেও হাজার খানেক মুসলিম ছাত্র। এই দুর্গেও সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কেন্দ্রীয় স্বারষ্ট্রমন্ত্রীর এনিয়ে দরাজ সার্টিফিকেটের পর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রায়শই জেহাদী নেতৃত্বকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্রটিতে। প্রশাসন হাত গুটিয়ে আছে। ফলত, মুসলিম দুষ্কৃতীদের লাগাতার দৌরাত্ম্যে তটস্থ এলাকার কয়েক ঘর হিন্দু।

জেলের বীভৎসতা

দোষী সাব্যস্ত হননি অথচ জেলে রয়েছেন ভারতবর্ষে এমন মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে ৩০ লক্ষ। শতাংশের হিসাবে এমন বন্দীর সংখ্যা নিদেনপক্ষে ৭০ শতাংশ তো হবেই। অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৬.৫ শতাংশের বেশি নয়। প্রতি দশ লক্ষ ভারতবাসীর জন্য ১৪ জন বিচারক রয়েছেন। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ইন্ডিয়া টু ডে ম্যাগাজিনে। তথ্য- পরিসংখ্যান থেকে একটা জিনিস অন্তত পরিস্কার যে এদেশে আজও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তবে এজন্য বিচারক সংখ্যার অপ্রতুলতা না কি বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসন যুগপৎ দায়ী তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই।

স্কুলপাঠ্যে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতা

বর্তমান শিক্ষাবর্ষেই হিন্দি সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার কিছু নির্দিষ্ট অংশ যোগ করতে চলেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মুখ্যসচিব রজনীশ বৈশ্য জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তা নিয়ে 'স্টাডি মেটিরিয়াল' তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত হিন্দি সাহিত্যে স্তর অনুযায়ী ধাপে ধাপে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার বিভিন্ন অংশ পাঠ্যসূচীতে যুক্ত করা হয়েছে। হিন্দির পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন সাহিত্যেও গীতার অংশবিশেষ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলিতে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান-কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উঠেছে। শিক্ষাবিদেরা মনে করছেন, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধের আদর্শ গড়ে তোলা যাবে। সরকারী স্কুলগুলির পাশাপাশি রাজ্যের অনেক বেসরকারী স্কুল স্কুলপাঠ্যে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতা ও বেদের দর্শনকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল আগেই।

আনবিটেন ২১

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস থেকে বর্ষণমুখর এবারের বর্ষা। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা একটা ছিলই যে ঘোর গ্রীষ্মে এবার মাঝে-মধ্যেই বৃষ্টি এসে যেভাবে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে তাতে না বর্ষার বারোটা বেজে যায়। সেই আশঙ্কাকে নিতান্ত অমূলক প্রমাণ করে ২১ আষাঢ় পার করেও বৃষ্টি অব্যাহত। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামক ভিলেন ঋতুর কাল পেছিয়ে দিচ্ছে গোছের মারাত্মক অপবাদের মধ্যেও বর্ষার শুরু থেকে টানা একুশ দিন, দিনের কোনও না কোনও সময় অঝোর ধারায় বঙ্গদেশের প্রতিটি প্রান্তকে ভাসিয়ে দিয়েছে। এহেন দুর্লভ তথ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং উত্তর যুগে কস্মিনকালেও পাওয়া যাবে কি না স্মরণ করতে পারছেন না বেশ কিছু প্রবীণ নাগরিকও। সংশ্লিষ্ট এক আবহবিদের রসিকতা— গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অনেক কু-প্রভাব সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে কোনও ঋতুকে এমন পাংচুয়াল এবং পারফেক্ট করে দিতে পারে তা তো জানা ছিল না!

বাপরে কি অর্থনীতি!

সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে গত ১৮ জুন খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছিল ৭.৭৮ শতাংশে। এর আগের সপ্তাহে নাকি এর হার ছিল ৯.১৩ শতাংশ। বর্ষার বাজারে জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে ভেবে এহেন সংবাদে পুলকিত চিত্তে বাজারের থলি হাতে যেই না বাজারে পৌঁছেছেন অমনি চক্ষু চড়কগাছ। ৯.৯৩ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির সময় যে পটল ছিল কেজি প্রতি ১০ টাকা, যে ঝিঙে ছিল কেজি প্রতি ১২ টাকা, যে করলা ছিল কেজি প্রতি ১৬ টাকা, ৭.৭৮ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির বাজারে একলাফে সেই পটল, ঝিঙে, করলা-ই বেড়ে হয়েছে কেজি প্রতি যথাক্রমে ৩০ টাকা, ৫০ টাকা ও ৬০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতি কমলে বুঝি দাম তিন-চার গুণ বাড়ে? বাপরে কি অর্থনীতি!

উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি

মধ্যপ্রদেশের ভূপালে জাবেরা বিধানসভা কেন্দ্র এবং বিহারের পূর্ণিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থীদ্বয়, যথাক্রমে দশরথ সিং লোধি এবং কিরণ কেশরী। মর্যাদার লড়াইয়ে বহু বছর ধরে জাবেরা কেন্দ্র থেকে জিতে আসা রত্নেশ সোলোমনের কন্যা তানিয়াকে ১১,০০০ ভোটে হারিয়ে দিলেন ২০০৮-এ ওই কেন্দ্রেই পরাজিত দশরথ। শ্রী সোলোমানের অকাল মৃত্যুতে সংঘটিত এই উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসীর সহানুভূতি ভোটের চাল ডাহা ফেল।

অন্যদিকে এই বছরের গোড়ায় জনৈক স্কুলশিক্ষকের হাতে নিহত রাজকিশোর কেশরীর স্ত্রী কিরণ কেশরী তাঁর প্রয়াত স্বামীর পূর্ণিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২৩,৬৬৫ ভোটে জেতেন। 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি'কে পুঁজি করলেও দুই বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজেপি-র জয়যাত্রা ঠেকাতে পুরোপুরি ব্যর্থ কংগ্রেস।

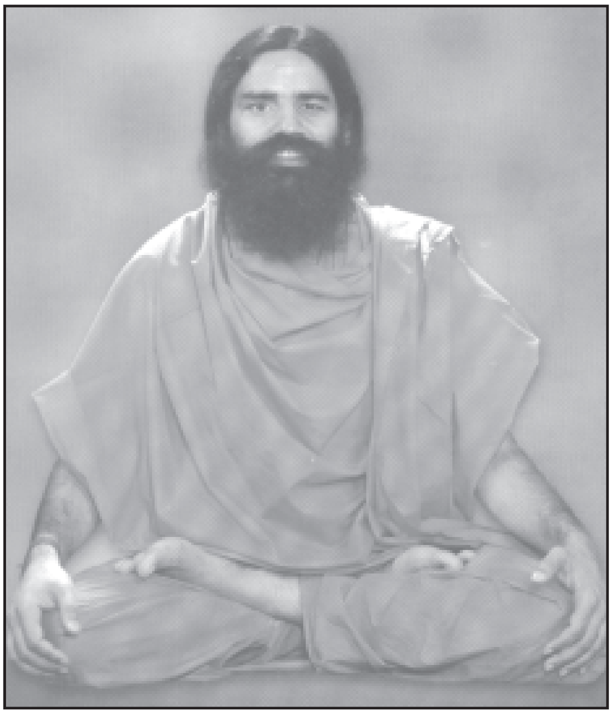

রামদেব অনশনে বসতেই কংগ্রেস এতটা উগ্র হয়ে উঠল কেন ?

সাধন কুমার পাল

এরকম আলোচনা এখন সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে, যে একজন বিদেশীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা কংগ্রেস দলটি আরেক বিদেশিনীর নেতৃত্বেই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে না তো? বৃটিশ রাজের সেফটি ভাল্‌ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস কি আজ পুরোপুরি ভ্রষ্টাচার এবং কৃষ্ণধনের মালিকদের সেফটি ভালভে পরিণত হয়ে গেল? কারণ দুর্নীতি ও কালো টাকার ইস্যুতে ফুঁসতে থাকা দেশের কোটি কোটি আমজনতার ক্ষোভের গায়ে রাজনীতির রঙ লাগিয়ে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস যেভাবে লুকোতে চাইছে তাকে এক কথায় বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে?

অবশ্য আরেকটা মতও শোনা যাচ্ছে। ৪ জুন রামলীলা ময়দানে অনশন সত্যাগ্রহে বসার অনুমতি দিয়ে তার আগের দিন চার মন্ত্রীকে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার জন্য সরাসরি বিমানবন্দরে পাঠিয়ে পোড়খাওয়া কংগ্রেসীরা এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে আন্না হাজারের অনশন প্রত্যাহার করানোর জন্য সরকার তার সঙ্গে যেমন সম্মানজনক আচরণ করেছিল ঠিক একই রকম সভ্য-ভব্য আচরণ করা হবে গেরুয়া বসনধারী হিন্দু সন্ন্যাসী রামদেবের সঙ্গেও। আলোচনার গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে স্বামীজীর দাবিদাওয়া মেনে বা যুক্তিসঙ্গত প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনশন থেকে নিরস্ত করতে নয় বরং দাবি মানতে না পারার অছিলায় অনশন মঞ্চে টেনে আনার ফাঁদ পাততেই ইউ পি এ সরকারের বাঘা বাঘা চার মন্ত্রী বিমানবন্দরে গিয়েছিল।

এর পরের ঘটনা সবার জানা। ৪ জুন স্বামীজী অনশনে বসার পর চিঠি চালাচালির নাম করে ইউ পি এ-র বকলমে কংগ্রেস দল দিনের আলো নিভে রাতের অন্ধকার নেমে আসার অপেক্ষা করছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী আবালবৃদ্ধবনিতা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। টিভির পর্দায় চোখ রেখে ঘটতে যাওয়া ঘটনা সরাসরি দেখার জন্য হয়তো প্রস্তুত হয়েছিলেন সোনিয়া ব্রিগেড। হয়তো সোনিয়া নিজেও। জলকামান, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ ঘুমন্ত মানুষগুলোর উপর। শিশু, মহিলার উপর অত্যাচারে বৃটিশের পুলিশকে ছাড়িয়ে গেল স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসীদের নির্দেশে পরিচালিত পুলিশ। কিন্তু হাত ছাড়া হয়ে গেল আসল লক্ষ্য। পোশাক পাল্টে আত্মগোপন করলেন স্বামী রামদেব। যখন ধরা পড়লেন তখন রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। হয়তো বা আত্মগোপন করেই বেঁচে গেলেন। না হলে কি হোত কে জানে! সেদিনের ঘটনার পর যদি স্বামীজী বেঁচে না থাকতেন তা হলে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার জন্য কি ধরনের গল্পের স্ক্রীপ্ট তৈরি করা হয়েছিল সেটাও অজানা থেকে গেল!

তবে ৪ জুন গভীর রাতে অপারেশন 'রামদেব'-এ চূড়ান্ত সাফল্য না এলেও যতটা সাফল্য এসেছে সেটাও বোধহয় কম নয়। কারণ দুর্নীতি ও 'কৃষ্ণধনে'র বিরুদ্ধে গেরুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে চলতে থাকা আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত তৈরি করে কংগ্রেস এক ঢিলে অনেক পাখি মেরেছে এমনটা কিন্তু অনেকেই মনে করছেন। (১) বছরের পর বছর নির্বাচনের সময় গুজরাট দাঙ্গার ভিডিও দেখানোর ফলে এখন আর ওটা পাবলিক খাচ্ছে না। ফলে ২০১২-র উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন ও ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা তুলে ধরে মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য হিন্দু সন্ন্যাসীর লাঞ্ছনার এরকম একটি তাজা দৃশ্যের প্রয়োজন আছে। (২) লালু, রামবিলাস, মুলায়ম, মায়াবতী, করুণানিধি, জয়ললিতার মতো দুর্নীতিগ্রস্তদের চোখে 'সেফটি ভাল্ভ' ইমেজ তৈরি করে স্থায়ী ও শক্তিশালী রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার জনগণকে চরম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে— এরকম একটি ঘটনার প্রয়োজন ছিল। (৩) কৃষ্ণধনের মালিকদের কাছেও সেফটি ভালভ ইমেজ তৈরির জন্য এই ধরনের একটি ভিডিও রেকর্ডিং দরকার ছিল।

অন্ধকারের পরিকল্পনা তো প্রকাশ্য দিবালোকে চালানো যায় না, সেজন্য ৫ জুন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শুরু হয়ে গেল রামলীলা ময়দানের তাণ্ডবসহ, দুর্নীতি ও কালোটাকার ইস্যুসহ গোটা বিষয়টিকে আর এস এস, বিজেপি'র অন্তরালে লুকোবার প্রয়াস। চর্ম চোখে মানুষ দেখল ২৪ ঘণ্টা আগে যার সঙ্গে সমঝোতা করতে গোটা ইউ পি এ সরকার উঠে পড়ে লাগল, সমঝোতা ভেস্তে যেতেই সে হয়ে গেল 'আর এস এস, বিজেপি'র মুখোশ'।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে স্বামী রামদেবের লাঞ্ছনার পিছনে কোন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র নেই তবুও

দুর্নীতি ও কালোটাকার ইস্যু নিয়ে কংগ্রেস আতঙ্কিত। কারণ মসনদ ধরে রাখার রসায়নে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কংগ্রেস নেতৃত্ব এটা বুঝতে পেরেছে যে দেশের কোটি কোটি আমজনতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বামী রামদেবকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে দিলে যে কোনও সময় সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। দুর্নীতির অভিযোগে আরও অনেক মন্ত্রীরই স্থান হতে পারে তিহার জেলে এ রাজা, সুরেশ কালমাদিদের পাশের ঘরে। বিপদ আসতে পারে দল ও সরকারের অন্তরাত্মারও। ফলে যেনতেনপ্রকারেণ এই আন্দোলনকে দমাতেই হবে। যার ফলশ্রুতিতেই ঘটল মধ্যরাতে রামলীলা ময়দানে নারকীয় পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা।

কিন্তু এই ঘটনা থেকে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, (১) গত ৯ এপ্রিল লোকপাল বিল নিয়ে আন্না হাজারের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়াটা আসলে কংগ্রেসী ম্যানেজারদের হীন কৌশল ছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আন্না হাজারের অনশন ভাঙ্গাতে পারলে পরে সময় নিয়ে কৌশল খাটিয়া বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে। (২) কংগ্রেসী অহঙ্কার ও দম্ভ নামক যে রোগটি ৭৫-এ দেশে জরুরী অবস্থা জারীর জন্য দায়ী ছিল, দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক সেই রোগের প্রাদুর্ভাব আবার ঘটছে। কার, এন ডি এ জামানায় সোনিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছিল। নানারকম জোড়াতালি দিয়ে সেখান থেকে উঠে এলেও পরপর দুবার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বাস্তব পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছে না। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবাংলার মানুষ সি পি এম-এর গৌতম দেব, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বসু, বিমান বসুদের মধ্যে ঠিক একই রকম জনবিচ্ছিন্ন অহঙ্কারী রূপ দেখতে পেয়েছিল।

(৩) দুর্নীতি ও কালোটাকার ইস্যু নিয়ে কংগ্রেস আতঙ্কিত। কারণ মসনদ ধরে রাখার রসায়নে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কংগ্রেস নেতৃত্ব এটা বুঝতে পেরেছে যে দেশের কোটি কোটি আমজনতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বামী রামদেবকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে দিলে যে কোনও সময় সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। দুর্নীতির অভিযোগে আরও অনেক মন্ত্রীরই স্থান হতে পারে তিহার জেলে এ রাজা, সুরেশ কালমাদিদের পাশের ঘরে। বিপদ আসতে পারে দল ও সরকারের অন্তরাত্মারও। ফলে যেনতেন প্রকারেণ এই আন্দোলনকে দমাতেই হবে। যার ফলশ্রুতিতেই ঘটল মধ্যরাতে রামলীলা ময়দানে নারকীয় পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে দুর্নীতি ও কালোটাকা বিরোধী আন্দোলন দমন করতে কংগ্রেস বর্তমানে দুটো ঘৃণ্যপথ অবলম্বন করেছে।

প্রথম পথটি হলো দুর্নীতি ও কালোটাকা উদ্ধার বা এই সংক্রান্ত কঠোর আইন প্রণয়ণের জন্য সরব মানুষদের চরিত্র হনন, সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা ও পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগের জালে জড়িয়ে দেওয়ার পথ। যেমন, আন্না হাজারে ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আয়কর দপ্তরকে লাগানো হয়েছিল, ভুয়ো জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে তাদের নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছিল। প্রশ্ন তোলা হবে, স্বামী রামদেবের পতঞ্জলি যোগপীঠের সম্পত্তি নিয়ে। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বামী রামদেব একাধিকবার দিয়েছেন। যাতে বলা হয়েছে স্বামীজীর ব্যক্তিগত কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তির মালিকানা নেই। যা আছে সবই পতঞ্জলি যোগপীঠের। এর সমস্ত লেনদেনই বিধিসম্মতভাবে পরীক্ষিত ও সেই অনুসারেই পরিচালিত এবং যে কেউ চাইলেই যখন তখন সেগুলো দেখতে পারে। ইউপিএ সরকারের বকলমে কংগ্রেসীরা সৎভাবে বিধিসম্মত উপায়ে সেসব দেখার প্রয়াস না করে নিয়ম করে মিডিয়াতে এই সম্পত্তি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে যাচ্ছেন। কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ তো সন্ত্রাসবাদী লাদেনকে 'লাদেনজী' বললেও আন্না হাজারে, স্বামী রামদেবের নাম উচ্চারণ করার আগে ঠগ, ভণ্ড এই সমস্ত বিশেষণ ব্যবহার করছেন। প্রশ্ন তুলছেন কে আন্না হাজারে? কে রামদেব? ওরা নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। কে ওদের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি বিরোধী এই সমস্ত আন্দোলনকে কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে ওরা বলছে 'অনশন করে' (পড়ুন আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে) গণতন্ত্রের মন্দির তথা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংসদকে আইন প্রণয়নে বাধ্য করানোর ভাবনা বিপজ্জনক প্রবণতা। এক শ্রেণীর বিশ্লেষক (পড়ুন কংগ্রেসী) তো অনশন সত্যাগ্রহকে 'সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপ' বলে অভিহিত করেছেন। মোটকথা দুর্নীতি ও কালোটাকার ইস্যুতে কোণঠাসা কংগ্রেস এখন মানুষকে বোঝাতে চাইছে যে নাগরিক সমাজ বড়জোর জন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে খুব বেশি হলে আবেদন-নিবেদন বা পরামর্শ প্রদান করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক তো সংসদ (পড়ুন সরকার)।

আশঙ্কার কথা এই যে ১৯৭৫ সালেও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে ঠিক এই ধরনের তত্ত্ব কথা আর গণতন্ত্র রক্ষার নামে জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছিল। ৪ জুন রামলীলা ময়দানের পুলিশি তাণ্ডব প্রমাণ করেছে যে কংগ্রেস দলের গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের মানসিকতার একটুও পরিবর্তন হয়নি। কংগ্রেস দলের বক্তব্য অনুসারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যদি সব সমস্যার সমাধান হতো তাহলে এদেশের প্রকৃত মালিক জনগণের সিংহভাগ আজ অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মনুষ্যেতর জীবনযাপনে বাধ্য হোত না। পাশাপাশি নৈতিকভাবে জনগণের সেবক জনপ্রতিনিধিরা কালোটাকার পাহাড়ে বাস করতেন না।

(৪) আন্না হাজারে ও স্বামী রামদেবের গড়ে তোলা অরাজনৈতিক মঞ্চের আন্দোলনের গায়ে কংগ্রেস চেনা রাজনৈতিক কৌশল ও ধারা অনুসারে রাজনীতির রঙ লাগিয়ে, এটিকে যেনতেনপ্রকারণে ক্ষমতার রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে টেনে নিয়ে বিষয়টিকে হালকা করে দিতে চাইছে। কিন্তু আমজনতার নাড়ির স্পন্দন যতটা অনুভব করা যাচ্ছে তা থেকে বলা যায় এবারের লড়াইটা বোধহয় একটু ভিন্নধারার। কারণ এদেশের প্রকৃত ইতিহাস ও পরম্পরা বলছে এদেশে রাজশক্তি কোনওদিনই শেষ কথা বলেনি। শেষ কথা বলেছে এদেশের সমাজ। এখানে 'সমাজ' শব্দটির অর্থ ইংল্যান্ডের সংস্কৃতি জাত 'সিভিল সোসাইটি'র অর্থের চেয়ে অনেক ব্যাপক। এই সমাজের গণ্ডির মধ্যে দেশের আনপড় মূর্খ নাগরিকটিও আসে। এদেশের রাজারা ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে এই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দুঃখ ব্যথা বেদনা অনুভব করতেন। এটিই বহুচর্চিত রামরাজ্যের মূল কথা। আজকে দুর্নীতি ও কালোটাকার ইস্যুটি এমন একটি ইস্যু যে, যার ন্যূনতম অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই সেও এই ইস্যুতে আন্দোলিত। ফলে এই ইস্যুতে সুবিচার চাইতে গিয়ে আন্না হাজারে, স্বামী রামদেবরা যখন লাঞ্ছিত হন তখন এই বেদনা দেশের মর্মস্থলে আঘাত করে। তখন লড়াইটা সিভিল সোসাইটি বনাম রাজনৈতিক শক্তি নয়, সামাজিক শক্তি বনাম ভ্রষ্টাচারী দাম্ভিক রাজশক্তি হয়ে যায়। আজ হচ্ছেও তাই। এখানে আন্না হাজারে স্বামী রামদেবরা শুধুমাত্র একটি জরাজীর্ণ ব্যবস্থা, একটি অসুস্থ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঞ্চিত সামাজিক ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম মাত্র।

এজন্য একজন সন্ন্যাসী বা দু-একজন সমাজসেবীকে ছলেবলে কৌশলে পর্যুদস্ত করলেই এ লড়াই থামবে না। যতক্ষণ না গোটা ব্যবস্থাটি পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ মাটি ফুটে নতুন নতুন লড়াইয়ের ক্ষেত্র ও নেতৃত্ব তৈরি হবে।

দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে সিদ্ধহস্ত ইউ পি এ-২ সরকার

অতিথি কলম

ডঃ জয় দুবাসী

কোনও জিনিস-ই বিশেষত রাজনীতি ভারতবর্ষে সোজাপথে চলে না। এটা বর্তমানে চোরদের ব্যবসা। যেমন ধরা যাক পি জে টমাসের কথা। টমাসের মামলায় অনেক কানা গলি রয়েছে। তার মধ্যে আপনাকে চলতে গেলে আপনি আন্দাজ করতে পারবেন না যে আপনি কোন গলি দিয়ে ঢুকছেন বা বেরোচ্ছেন। যেমন ধরুন পি জে টমাসের মামলা শেষ হয়ে গেছে আপনি যখন ভাবছেন ঠিক তখনই টমাসের ঘোষণা— তিনি আবার সেই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন যে কোর্ট তাঁর নিয়োগকে অবৈধ বলে খারিজ করে দিয়েছে। অবশ্য তিনি সেই বেঞ্চে যাচ্ছেন না যে বেঞ্চ তাঁর নিয়োগকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা ভাবছেন সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন বা সিভিসি-তে টমাসের নিয়োগ এক অতি সরল ব্যাপার তাদের অনুমানের মধ্যে নেই যে, এই নিয়োগ কেবল প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই যুক্ত নন, সরকারে অন্দরে অন্য কারুর ইশারা রয়েছে। এরা সবাই চুপিসারে রয়েছে, যখন কেচ্ছা ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে তখন এদের হাত কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ব্যাপার আর ধামার ভিতরে চাপা নেই, আমরা সবাই তা ধীরে ধীরে জানতে পারছি।

বাস্তবে এই নিয়োগ একটি ষড়যন্ত্রের অংশ, একে কেবল এক ‘নিয়োগ’ বলে সরলীকরণ করলে ভুল হবে। এর মধ্যে অনেকেই যুক্ত এবং এদের মধ্যে একজন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন যিনি এখন একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

সেই ব্যক্তি পৃথ্বীরাজ চৌহান চুপচাপ। এই বিষয়ে মনমোহন যখন সংসদে মুখ খোলেন এবং বিষয়টা তাঁর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেন তখনই কেবল মি. চৌহান মুখ খোলেন। অবশ্য চৌহানের নাম সরাসরি উচ্চারণ না করে কেবল তাঁর পূর্বতন পদের উল্লেখ করেন। আগে কেন মি. সিং চৌহানের নাম বলতে ভুলে গেলেন? চৌহান তালিকা তৈরি করেন বটে, কিন্তু অন্য একটি মামলায় টমাসের নাম জড়িয়ে আছে তার উল্লেখ নেই। চৌহানের বক্তব্য হলো— মামলার বিষয়ের ওপর নোট তিনি তৈরি করেননি, করেছে কেরল সরকার আর উনি তা পত্রপাঠ তিন সদস্যের নিয়োগ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ধরেই নেওয়া যায় বিষয়টা চৌহান দ্বারা পরিমার্জিত হয়েছে। কেরল মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যায় চৌহান মিথ্যা বলছেন— এমন অভিযোগ রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উঠছে, কিন্তু বিষয়ে চৌহানের পক্ষ থেকে কোনও উত্তর নেই।

সুতরাং আমরা জানতে পারছি, এই নিয়োগের সঙ্গে পাঁচ ব্যক্তি জড়িয়ে রয়েছেন। তিনজন নয়, আগে যা ভাবা হয়েছিল। বিষয়টা এখানেই শেষ নয়। আদবানীর মতে টমাসের বিষয়টা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। তিনি বলছেন যে, তিনি যখন বিরোধী দলনেতা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের সুপারিশ ক্রমে চিফ ভিজিল্যান্স কমিশনার হিসেবে টমাসের নাম সামনে এলে মনমোহনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। সেই সময়-ই আপত্তি ওঠে এবং চৌহানের কাছ থেকে ক্রমাগত চাপ আসতে থাকে যাতে তিনি টমাসের নিয়োগে সায় দেন।

সুতরাং এখন দেখছি এই ব্যাপারে পাঁচ নয়, সাতজন জড়িয়ে। এখানে আরও অনেক ব্যক্তি জড়াতে পারলেও বিষয়টা কেবল ষড়যন্ত্র। বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা মনমোহন আর চৌহানের হাতে অনেকদিন যাবৎ ঝুলে রয়েছে। টমাসের নিয়োগে যে ব্যক্তির হাতে চাবিকাঠি রয়েছে তিনি অলক্ষ্যেই তাঁর বোতাম টিপে যাচ্ছেন এবং বিষয়টির সঙ্গে মনমোহন বেশ কিছুদিন ধরে যুক্ত। কখনও তাঁর সঙ্গী চৌহান, কখনও আবার তারও আগে শিবরাজ পাটিল। এখন প্রশ্ন হলো— টমাস নিয়ে এঁদের কিসের এত আগ্রহ? এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কে রয়েছে? নইলে সংসদে বিষয়টা উত্থাপন করতে তাঁর এত দ্বিধা কেন? এমনভাবে পেশ করলেন মনে হয় বিষয়টার ভার নিয়োগ কমিটির উপর। সেপ্টেম্বর তিন তারিখে নিয়োগ কমিটির বৈঠকেই যা সিদ্ধান্ত হবার হবে। এই বিষয়ে তাঁর হাত সাফ সুরৎ।

প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্র আরও এগোল। খবরে প্রকাশ যখন টমাসের নিয়োগ নিয়ে প্যানেলের সদস্যরা আলোচনায় রত ঠিক সেই সময়ে চৌহান পাশের ঘরে উপবিষ্ট। পরিষ্কার যে, টমাসের নিয়োগ নিয়ে বেশ কিছুকাল যাবৎ গোপনে প্রয়াস চালিয়ে এসেছেন। আর আমাদের তথাকথিত সৎ বন্ধুবরটি যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না। এটা সম্ভব হতে পারে যে, সমস্ত কংগ্রেসম্যান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ মতো কাজ করেছে। লোকটির সততা নিয়ে সওয়াল উঠছে কেন?

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, চিদাম্বরমসাহেব এ ব্যাপারে একদম স্পিকটি নট। তাঁর মতো এক পদমর্যাদার মানুষের কাছ থেকে উত্তর বা ব্যাখ্যা না পাওয়াটা অনভিপ্রেত। আর যাই হোক তিনি তো তিন সদস্যের কমিটি এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বাস্তবে জনশ্রুতি অনুসারে যখন বিষয়টা নিয়ে বেশ জল ঘোলা হচ্ছে তিনি মুখে কুলুপ আঁটলেন। পরিষ্কার যে, তাঁকে চুপ থাকতে বাধ্য করা হলো কারণ অনেক সময়েই বিরোধীদের সামনে বা মিডিয়ায় সামনে তিনি যাতে বেফাঁস কথা বলে না ফেলেন। চিদাম্বরমের নীরবতা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশী অর্থবহ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বিরোধীপক্ষ এই বিষয় নিয়ে তেমন একটা সাড়া জানাতে পারলো না। এরা প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যার আগে বা পরে একেবারে চুপচাপ। তাঁদের মতে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা চান, কিন্তু আসলে তা ক্ষমা চাওয়া নয়। সম্ভবতঃ এসব এক কৌশলগত খেলা। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে বিরোধীরা যেভাবে এই দুর্নীতির বিষয়ে সরকারি বরিষ্ঠ অধিকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

আমরা আশঙ্কা টমাসের নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতিতে যুক্ত এতগুলি বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং এই মামলা যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে অন্য দুর্নীতির মামলাগুলির আদৌ টিকবে কনা সন্দেহ। আমরা ধারণা স্পেকট্রাম ২-জি মামলারও কোনও নিষ্পত্তি হবে না আর রাজা বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। আর হাসান আলি মামলার একইভাবে বিনা নিষ্পত্তিতেই শেষ হয়ে যাবে যদিও অভিযুক্ত হাসান আলির বর্তমান ঠিকানা জেল। কমনওয়েলথ গেমস তো লোকেপ্রায় ভুলতে বসেছে যদিও এই দুর্নীতির প্রধান এখন জেলে। অন্যান্য দুর্নীতির ক্ষেত্রে যত কম বলা যায় তত ভাল। মনে হয় দুর্নীতির দেখভালের জন্য এক বিশেষ সেল রয়েছে কংগ্রেসের। যখন একটু আধটু হৈ চৈ হয় এবং দুর্নীতিতে যুক্ত দু-একজনকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে যে আইন তার নিজের পথেই চলছে। প্রয়োজন হলে সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কেউ সংসদে বিবৃতি দিয়েই খালাস। দু-এক মাস দেখে লোকে যখন সব ভুলে গিয়ে হৈ-চৈ বন্ধ করে দেবে তখন চুপিসারে ফাইল বন্ধ করে দাও। দুর্নীতি বিষয়ে এটাই এখন চালু প্রক্রিয়া আর যা কখনও ব্যর্থ হয় না!

দুর্নীতির পঙ্কোদ্ধারে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোকপাল বিল

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

লোকপাল-বিল নিয়ে সম্প্রতি আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দিয়েছে। বিলটাকে সার্থকভাবে তৈরি করার জন্য আন্না হাজারে আমরণ অনশন শুরু করায় সরকার বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করেছে, গঠন করেছে একটা কমিটি— তাতে দশ জনের কমিটিতে রাখা হয়েছে নাগরিক সমাজের পাঁচজনকে। কিন্তু কাজ না এগোনোয় যোগগুরু রামদেবও কিছু শর্ত দিয়েছেন। গত ৪ জুন তিনি তাঁর অগণিত ভক্ত নিয়ে রামলীলা ময়দানে শান্তিপূর্ণ অনশন শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ওই দিন কেন্দ্রের পুলিশ বীরবিক্রমে মধ্যরাতে লাঠি চালিয়ে সেই সমাবেশ ভেঙে দিয়েছে। সেই অনশন-মঞ্চ ছিল শান্তিপূর্ণ, নিদ্রিত। কিন্তু এক বর্বরোচিত আক্রোশে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ সেখানে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে নতুন জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটিয়েছে। পরে এর জন্য অবশ্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তিনি বলেছেন যে, এক্ষেত্রে সরকারের অন্য কিছু করার ছিল না।

বোঝা যায় যে, তাঁর দুঃখ প্রকাশের কুম্ভীরাশ্রু এই কুনাট্যের একটা অভিনব ব্যাপার। আসল বিষয়টা ছিল একটা স্বচ্ছ, স্বাভাবিক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা। সেই কাজটা না করে সরকার তার পুলিশী ক্ষমতা দেখিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির চৌষট্টি বছর পরেও একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এভাবে তার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করবে—এটা চিন্তাই করা যায় না।

এটা সকলেরই জানা যে, এই দেশ দুর্নীতিতে ডুবে আছে—ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত সর্বস্তরে পাপ, গ্লানি ও অন্যায় ঢুকে গিয়েছে। জার্মানীর বিখ্যাত 'ট্র্যান্সপ্যারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল' জানিয়েছে যে, বিশ্বের ৯৬টা দেশের মধ্যে ভারতের সাধারণ মানুষ দুর্নীতির দিক থেকে আছেন ৭৬ নং স্থানে, অথচ রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে স্থানটা ৬ নম্বরে। সেই সঙ্গে আমলা, বিচারক, পুলিশ, অফিসার ইত্যাদির মধ্যেও আছে দুর্নীতি। আমাদের গোটা সমাজটাই এখন দূষিত-গলিত-বিষাক্ত হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দাবি করেছেন লোকপাল ও লোকায়ুক্তদের অবিলম্বে নিযুক্ত করা হোক, যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে। তাঁরা উচ্চ মহলের অন্যায়, দুর্নীতি ইত্যাদির তদন্ত করে দেশকে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, আন্না হাজারে, রামদেব প্রমুখ শ্রদ্ধেয় মানুষরাও এই দাবি তুলেছেন। দেশে ভ্রষ্টাচারের সার্বিক নিরাকরণ, বিদেশে-সঞ্চিত কালো টাকাকে জাতীয় সম্পত্তি রূপে ঘোষণা করে দেশে ফিরিয়ে আনা, ভ্রষ্টাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির সঙ্গে তাঁরা একজন কার্যক্ষম লোকপাল নিয়োগের দাবিও তুলেছেন জোরালো ভাবেই।

আসলে, আমাদের দেশের 'লোকপাল' পদের ধারণাটা এসেছে ইওরোপের 'Ombudsman'- পদটা থেকে। সর্বপ্রথম সুইডেন এই পদটা সৃষ্টি করে উচ্চ মহলের দুর্নীতি দূর করার জন্য। ক্রমে তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এই পদটার প্রবর্তন করেছে। ডি জি রোয়াট মন্তব্য করেছেন, 'In recent years, the Scandinavian office of Ombudsman has gained widespread attention in the democratic world...' (দ্য ওমবুডস্ম্যান, পৃ: ৪)।

এই দেশে লোকপাল-পদ সৃষ্টির দাবিটা আজকের নয়। ১৯৫৯ সালেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি ডি দেশমুখ উচ্চ মহলের দুর্নীতির অনুসন্ধানের জন্য এই পদ সৃষ্টির কথা তুলেছিলেন। তাৎপর্যের বিষয় হল—ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও রাষ্ট্রপতি থাকার সময়

ঐক্যমত্য অধরা

ন'টি বৈঠকের পরেও যৌথ দুর্নীতিবিরোধী কমিটি পৌঁছতে পারল না কোনও ঐক্যমত্যে। হাজারে বাহিনী ও কেন্দ্রীয় সরকারের মতের অমিলগুলো তুলে ধরা হলো এই সারণীতে।

হাজারে বাহিনীর বক্তব্য	সরকারের বক্তব্য
১. প্রধানমন্ত্রী এবং উচ্চতর আইনবিভাগকে লোকপাল বিলের আওতায় নিয়ে আসা।	১. একমাত্র পদত্যাগ করার পরেই প্রধানমন্ত্রী তদন্তের মুখোমুখি হতে বাধ্য থাকবেন, পদত্যাগ করার আগে নয়। বিচারপতিদের জন্য বিচার বিভাগীয় গ্রহণযোগ্যতা বিল (জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিল) আনা হবে।
২. সংসদে সাংসদদের আচরণের তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।	২. লোকসভার অধ্যক্ষের মতামতকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
৩. দ্য লোকপাল সিলেকশান কমিটিতে হাতে গোনা কয়েকজনমাত্র রাজনীতিক রাখা উচিত।	৩. সিলেকশান কমিটিতে রাজনীতিকদের প্রাধান্য থাকবে।
৪. সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের বিচারের ভার লোকপালের ওপর ন্যাস্ত থাকবে।	৪. যাঁদের পদ যুগ্ম-সচিব স্তরের কেবল তাঁরাই লোকপাল বিলের আওতায় আসবেন, সমস্ত সরকারি কর্মচারী নন।
৫. যাঁরা জেনেশুনে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করবেন তাঁদের ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে, কিন্তু জেল হবে না।	৫. এক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য যাঁরা জেনেবুঝে মিথ্য অভিযোগ দায়ের করবেন তাঁদের ২ লক্ষ টাকা করে জরিমানার পাশাপাশি অপরাধের গুরুত্ব বুঝে শাস্তি হিসেবে ২ থেকে ৫ বছর অবধি জেলও হবে।
৬. কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই) এবং সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সিভিসি)-কে লোকপালের আওতায় আনা।	৬. লোকপালের নিজস্ব তদন্তকারী সংস্থা থাকা উচিত।

এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল—প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, আমলা ও উচ্চ স্তরের অফিসারদের অন্যায় ও দুর্নীতি নিয়ে এই পদাধিকারীকে অনুসন্ধান করার দায়িত্ব দেওয়া হোক। তারপর ১৯৬২ সালে নিখিল ভারত আইন অধিবেশনেও (Law Conference) এই ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর, পরের বছর বিচারপতি পি সি গজেন্দ্রগাদকারও দিল্লির 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এ এই ধরনের মত ব্যক্ত করেন।

অবশ্য আমাদের সংসদে এই প্রস্তাব প্রথম তুলেছিলেন ড. এল এম সিংভী—সেটা ১৯৬৩ সালের কথা। তাৎপর্যের কথা হলো— প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল এম সি শীতলবাদও জানিয়েছিলেন যে, উচ্চ মহলের দুর্নীতি দূর করার জন্য এই ধরনের পদ সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী। দাবিটা জোরালো হয়ে উঠেছিল 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি' (Administrative Reforms Committee বা ARC) এই প্রস্তাবটা সমর্থন করার ফলে।

সুতরাং বলা যায়, দেশে যখন দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার ব্যাপক আকারে ধারণ করেনি, তখন থেকেই লোকপাল-পদের সৃষ্টি নিয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দাবিটা তুলেছেন। ARC তো বটেই রাজস্থানের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিও এই ব্যাপারে একমত হয়েছিল।

অবশ্য সংসদে এই নিয়ে বিল পাশ হয়েছিল আরও পরে—১৯৬৯ সালে। বলা হয়েছিল—

১. কেন্দ্রে ও রাজ্যস্তরে যথাক্রমে একজন করে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত নিযুক্ত করা হবে;

২. রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও বিরোধী-নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে লোকপালকে নিযুক্ত করবেন। লোকায়ুক্তকে তিনি নিয়োগ করবেন লোকপালের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে;

৩. তাঁদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। তবে তাঁদের আরেকটা মেয়াদ রাখা যেতে পারে;

৪. অবসরের পর তাঁরা কোনও সরকারী পদে নিযুক্ত হবেন না। অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তাঁদের রাজ্যস্তরে নিযুক্ত করা যাবে; এবং

৫. অক্ষমতা বা দুর্নীতির দায়ে সরকারের প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাঁদের বরখাস্ত করতে পারবেন।

কিন্তু ১৯৭০ সালে লোকসভাকে ভেঙে দেওয়ার ফলে বিলটাও বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য জনতা সরকার ১৯৭৮ সালে বিলটা আবার তুলেছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে লোকসভা ভেঙে যাওয়ায় সেবারও তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে।

এরপর আরও দু-একবার এই ধরনের প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। বলা চলে— লোকপাল-পদ সৃষ্টির জন্য ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রয়াস ঘটলেও, আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা এগোয়নি। ডঃ জে পি জোহারীর মতে, এর কারণ হলো বিভিন্ন সরকারের 'callons indifference'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৭৯৩)।

আসলে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার চেয়েছে নিজেদের গায়ে আঁচড় না পড়ুক। মনে হয়, দুর্নীতি ও অবিচারকে কর্তা-ব্যক্তিরা নির্মূল করতে চানইনি। তার ফলে নানা ফ্যাকড়া তুলে এতদিন বিষয়টাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে বিরোধের মূলে দাঁড়িয়েছে একটা ভীতি—প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের আওতায় রাখা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন উঠছে—প্রধানমন্ত্রী কি সব সময় দুর্নীতি ও অন্যায়ের উর্ধে থাকেন? তাছাড়া আরও বিরোধ বেধেছে লোকপালের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ব্যাপার নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে—এই পদ সংসদের ওপরে কিনা।

মোট কথা— নানা অজুহাতে ব্যাপারটাকে ১৯৬৯ সাল থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আর সেই সুযোগে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। এম সি জৈন বাগচী মন্তব্য করেছেন, কোনও সরকারই এই ব্যাপারে আন্তরিকতা বা আগ্রহ দেখায়নি--- 'the Government of India have not shown much enthuaism'—(দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল, পৃ: ১৭৮)।

এবারেও সেই পুরনো প্রশ্নগুলো উঠে পড়েছিল—প্রধানমন্ত্রীকেও লোকপাল বিলের মধ্যে আনা হবে কিনা, লোকপালের সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক কি হবে, বিচারবিভাগকে এর মধ্যে জড়ানো যায় কিনা—এই সব প্রশ্ন উঠে পড়েছে আবার। আন্না হাজারে তাই সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি—তাঁর দাবি অনুসারে নাগরিক সমাজ থেকে পাঁচজনকে রাখা হয়েছে কমিটিতে।

কিন্তু দু-পক্ষের মধ্যে কয়েকবার বৈঠক হলেও কোনও মতৈক্য হয়নি বাস্তব কারণে। ২১ জুন ছিল শেষ বৈঠক। তাতে দুই পক্ষই নিজেদের খসড়া বিল পেশ করেছে। সরকারের তরফে মন্ত্রী কপিল্ সিবাল জানিয়েছেন, কোন মতেই প্রধানমন্ত্রীকে এই বিলের আওতায় আনা যাবে না। তাঁর মতে, লোকপালের হাতে বিপুল ক্ষমতা থাকবে— কিন্তু এই পদকে সরকারের সমান্তরাল করা চলে না।

দেখা যাচ্ছে, ওই বৈঠকেও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য রয়ে গেছে। যেমন— প্রধানমন্ত্রীকে এর আওতায় আনা হবে কিনা; বিচারবিভাগের শীর্ষ পদাধিকারীর সঙ্গে সম্পর্ক কি হলো; মুখ্য আমলা ও সংসদের মধ্যে সাংসদদের কাজকর্ম এর মধ্যে পড়লে কিনা; লোকপালকে নির্বাচিত করছেন কে; তাঁকে অপসারিত করার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে এবং তাঁর তদন্তের প্রক্রিয়া কি হবে।

দু-পক্ষই মেনে নিয়েছে যে, এই বিষয়গুলোই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই রয়েছে মৌলিক মতপার্থক্য। আন্না হাজারে বলেছেন, এই ধরনের মনোভাবের দ্বারা সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, একটা নিরপেক্ষ ও কার্যক্ষম লোকপাল-পদ সরকার চায় না। সুতরাং তাঁকে আবার আমরণ অনশনের পথে যেতেই হবে। আর নাগরিক সমাজের প্রশান্তভূষণ মনে করেন—একটা শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ লোকপাল-পদ সৃষ্টি সরকারের বোধহয় কাম্যই নয়—(দ্য স্টেট্সম্যান, ২২.৬.১১)।

প্রশ্ন হলো—প্রধানমন্ত্রীকে কেন উক্ত বিলের বাইরে রাখতে হবে? তিনিও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারেন বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারেন—সেক্ষেত্রে তিনি লোকপালের আওতার মধ্যে থাকবেন না কেন? সরকারের যুক্তি— সংসদীয় ব্যবস্থার ভরকেন্দ্র হলেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে যে কোনও আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেই হবে।

এটা কিন্তু কোনও যুক্তিই নয়। তাঁকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি বিস্তৃত হলে কি হবে?

অন্য বিষয়গুলো অবশ্য বিতর্কিত। বিচারপতিদের অবশ্য এর আওতায় আনা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিন্তু রামস্বামী, দিনাকরণ প্রমুখ বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁদের কিছু করা যায়নি। সংসদের ভেতরে সাংসদদের কাজকর্মও লোকপালের আওতায় আনেন না, কারণ সেটা দেখেন স্পীকার। লোকপালের অপসারণের ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকা উচিত। কিন্তু সাধারণত তিনি চলেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রী যদি ন্যায়নিষ্ঠ লোকপালকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট-গ্রহণটাও উদ্ভট ব্যাপার হবে— কারণ সাংসদরাও লোকপালের আওতাভুক্ত।

কিন্তু যেভাবেই হোক, একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। আন্না হাজারে বলেছেন---১৫ আগস্টের মধ্যে ব্যাপারটার ফয়সালা না হলে তিনি আমরণ অনশনে আবার বসবেন। কিন্তু সেটা সমাধান নয়। এবার দুটো খসড়াই রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হবে, জুলাইতে ডাকা হবে সর্বদলীয় সভা। সেখানে একটা সমঝোতা করতেই হবে। ডঃ জোহারী মনে করেন— সমস্যার মূলে আছে 'party politics'। কিন্তু দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে। রাজনীতির এই নারকীয়তার মধ্যেই লোকপাল হবেন সৎ ও নিরপেক্ষ— এম পি জৈনের ভাষায় ---'politically neutral'--- (ওমবুডসম্যান ইন ইন্ডিয়া, পৃ: ১০৬) তিনি হলেন স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার মূর্ত প্রতীক।

ভোরা কমিটির মতে, এই দেশে দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে, ওপর মহলের ভ্রষ্টাচার ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে নিচের দিকে—দুর্নীতির এক সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একে দূর করতে হলে লোকপাল-পদ সৃষ্টি করতেই হবে। আর তার জন্য দল ও মতের পার্থক্য তুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সব নেতাকে।

বহুকাল কেটে গেছে— আর নয়।

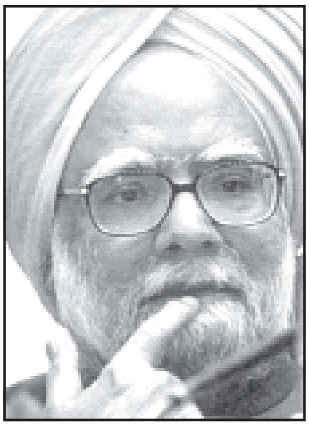

লোকপাল বিলে প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করতে কংগ্রেসের এত আপত্তি কেন ?

লোকপালের মতো বিল রচনা করার দায়িত্ব নেতাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া বিধেয় ? অতীতে দেখা গেছে নেতাদের নিয়ে যেসব বিল তৈরি হয়েছে তা খাড়া করেছে সংশ্লিষ্ট আমলা বা নেতারা। যে লোকপাল বিল এইসব আমলা বা নেতাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তা কীভাবে নিরপেক্ষ হবে বলে আশা করা যায় ? তাই লোকপাল বিলের খসড়া তৈরিতে নাগরিক সমাজের সামিল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তারক সাহা

আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় ইস্যু। এতটাই এর গুরুত্ব যে আন্না হাজারে, রামদেব প্রমুখ ব্যক্তিত্বের আন্দোলনের ছত্রতলে সাধারণ মানুষ সমবেত হয়েছে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। সেই সময়েও প্রধামন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষ এককাট্টা হয়েছিল জয়প্রকাশের ছত্রতলে। সেই আন্দোলনের জেরে টলে গিয়েছিল তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার আসন। কেউ সেই সময়ে ভারতেও পারেনি যে, ভারতীয় গণতন্ত্রে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব।

ঠিক প্রায় চারদশক বাদে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে এদেশে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি মানুষকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আম-জনতার দেওয়া করের প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে শুধুমাত্র দুটো কেলেঙ্কারীতে। স্পেকট্রাম ২-জি আর কমনওয়েলথ গেমসে। '৭৫ সালে ইন্দিরার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নির্বাচনে কারচুপি। স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে জরুরি অবস্থা জারি করে ব্যাপক ধরপাকড় করে আমজনতার মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়েছিলেন। সেই সময়ে ইন্দিরার এই স্বৈরতন্ত্রকে উগাণ্ডার ইদি আমিনের সঙ্গে তুলনা করা হোত।

'৭৫ সালের সঙ্গে এবারের জনতার রোষের তুলনা করা যায় কয়েকটা ক্ষেত্রে। '৭১ সালে বাংলাদেশ বিজয়ের পর ইন্দিরার অপরিসীম জনপ্রিয়তা তাঁকে অনেক বেশি স্বৈরতন্ত্রী করেছিল। এবারেও সেই একইদল ক্ষমতায়। তফাত শুধু সেই সময়ে ইন্দিরার জমানা ছিল নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ। আর ইন্দিরা ছিলেন অনেক শক্ত মানুষ। চার দশক বাদে চিত্রটা বদলে গেছে অনেকটাই। এবারের প্রধানমন্ত্রী এদেশে এযাবৎ যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তারমধ্যে সবচেয়ে দুর্বল। দুর্নীতির বিপাকে পড়লেই জোটের দোহাই পাড়েন। নিজের সিদ্ধান্ত নেবার কোনও ক্ষমতাই নেই। ১০ নম্বর জনপথের নির্দেশ এলেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নড়েন দম দেওয়া পুতুলের মতো— অন্যথা স্থবির।

এইরকম একটা বাতাবরণে আন্না হাজারের পিছনে দাঁড়িয়েছে নাগরিক সমাজ ঠিক যেমনটা হয়েছিল '৭৫ সালে। এবারে কংগ্রেস অনেক বেশি শঙ্কিত। এতটাই শঙ্কিত দলের পঞ্চপাণ্ডব কখন কী বলছেন তার কোনও ঠিক নেই। কখনও এঁরা আন্না-রামদেবকে তোয়াজ করছেন, কখনও আবার অনশনের মতো গান্ধীবাদী আন্দোলনে রামদেব যখন সামিল তখন তাঁকে জোর করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এতেই স্পস্ট কংগ্রেস কতটা শঙ্কায় ভুগছে।

লোকপাল বিল নিয়ে কংগ্রেস কেন প্রধানমন্ত্রীকে এর আওতা থেকে বাইরে রাখতে চাইছে ? এর সম্ভাব্য কারণ হলো—(১) আগামী বাদল অধিবেশনে যৌথ সংসদীয় কমিটি-র ২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারীর রিরোর্ট পেশ হতে চলেছে। পি এ সি-র মতো যৌথ সংসদীয় কমিটি ও প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তরের দায়বদ্ধতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারে বা বলতে পারে স্পেকট্রাম ২-জি কেলেঙ্কারিতে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নেতৃত্বের দায় অস্বীকার করতে পারেন কেবলমাত্র এ রাজা বা কানিমোঝিকে জেলে পাঠিয়ে। কারণ যৌথ সংসদীয় কমিটিতে ডি এম কে-র সদস্যরাও রয়েছেন। এঁদের দল যখন কেলেঙ্কারীতে যুক্ত সুতরাং তাঁরা যে মনমোহনকে ছেড়ে কথা বলবে না এটা সহজেই বোঝা যায়। তাই নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে ডি এম কে-র নৌকাডুবির পর মনমোহন টিম আর চড়তে চাইছে না ডি এম কে-র নৌকায়। সবলতার সঙ্গে সবাই তাই নতুন পরিস্থিতিতে টিম মনমোহন- জয়ললিতার হাত ধরতে চাইছে। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে দুই চিরশত্রুর দল এ আই ডি এমকে অবশ্যই করুণানিধিকে আরও কোণঠাসা করতে চাইবে। আগামী দিনগুলি অপেক্ষা করবে রাজধানী-রাজনীতি কোন দিকে মোড় নেয়। তাই টিম মনমোহনের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের আওতায় আনতে চাইলেও কংগ্রেস-এর পরিপন্থী। কারণ আগামীদিনে যদি বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তো তাতে কংগ্রেস দল আর সরকারের বিড়ম্বনা বাড়বে বৈ কমবে না। (২) অতীতের ইতিহাস অনুসারে কংগ্রেস মনে করছে

২০১৪ বা তৎপরবর্তী সময়ে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসবে এবং ২০১৪ সালেই মনমোহনের সরে যাবার সম্ভাবনা প্রবল এবং তখন যদি রাহুল ক্ষমতায় আসেন আর যদি কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তবে তার আওতায় রাহুল পড়লে সোনিয়াজী-র বিড়ম্বনা বাড়বে, তাই প্রথম রাতেই বিড়াল মারার নীতি নিয়েছে কংগ্রেস।

কিন্তু কেন প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তর এর বাইরে থাকবে? জয়প্রকাশ-আন্না হাজারে-রামদেবের আন্দোলনকে কংগ্রেস অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক বলে গালমন্দ করছে। কিন্তু সংবিধানেই তো রয়েছে সকলের জন্য সমান আইন প্রয়োগের সরকারি দায়বদ্ধতা। তবে কেন এমন কংগ্রেসী অনীহা? যদি কোনও কারণে এমনটা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর তখতে দেখি মধু কোড়া, এ রাজা, কানিমোঝির মতো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির নেতাদের, তবে কি এঁদের বিরুদ্ধে লোকপাল প্রয়োগ করা হবে না? কংগ্রেস এর জবাব দিক। লোকপাল যখন বিভিন্ন আমলা, সাংসদ প্রভৃতিদের লোকপাল বিলের আওতায় আনতে চাইছে, তবে কেন প্রধানমন্ত্রী উচ্চ আদালতের দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারপতিরা এর বাইরে থাকবেন তা বোধগম্য নয়। জয়প্রকাশ, আন্না হাজারেরা অসাংবিধানিক নন, বরং অসাংবিধানিক কংগ্রেস আর কেন্দ্রীয় সরকার। সংবিধানের অনুচ্ছেদ না মেনে সরকার বরং অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে আর স্বৈরতন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে রামদেব, আন্না হাজারে গণজাগরণের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে।

কংগ্রেসের বিভিন্ন মুখপাত্র সমন্বয়ে বলছেন নাগরিক সমাজ কীভাবে নিজেরা আইন তৈরীর কথা বলতে পারে নির্বাচিত সংসদকে এড়িয়ে। এইসব নেতারা বোধহয় ভাবের ঘরে চুরি করছেন। লোকতন্ত্রে সরকার বা সংসদ নির্বাচিত হয় জনতার ভোটে। জনতা যদি এমন নেতা সাংসদে নির্বাচিত করে পাঠায় যারা পরবর্তীকালে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত হয় পরে তবে কি সেইসব নেতাদের ঘাড় ধরে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার নেই নির্বাচকমণ্ডলীর? যদি আমাদের নেতারা সৎ হতেন তবে নাগরিক সমাজের দরকার পড়ত না। জয়প্রকাশ-আন্না হাজারে-রামদেবকে রাজপথে নামতে হোত না। আন্না হাজারে-রামদেবরা সকলেই এই সমাজের অঙ্গ। তাই সংবিধান এঁদের প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছে জনগণকে ঠিক পথে পরিচালনা করার।

আন্না হাজারে বা রামদেবরা একটাই দাবি তুলেছেন—দুর্নীতি হটাও আর দেশে এক সৎ পরিচ্ছন্ন প্রশাসন আসুক। দুর্নীতি এদেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সৎ, পরিচ্ছন্ন সরকার, প্রশাসন-দেশের সমস্ত মানুষের এই প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু নাগরিক সমাজ ও তার নেতাদের গালমন্দ করে অস্বাভাবিকতাকেই বৈধতা দিতে চাইছে কংগ্রেস। চোরকে জেলে না পাঠিয়ে চোরদেরই পিঠ চাপাড়াচ্ছে।

তাহলে কি লোকপালের মতো বিল রচনা করার দায়িত্ব নেতাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া বিধেয়? অতীতে দেখা গেছে নেতাদের নিয়ে যেসব বিল তৈরি হয়েছে তা খাড়া করেছে সংশ্লিষ্ট আমলা বা নেতারা। যে লোকপাল বিল এইসব আমলা বা নেতাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তা কীভাবে নিরপেক্ষ হবে বলে আশা করা যায়? তাই লোকপাল বিলের খসড়া তৈরিতে নাগরিক সমাজের সামিল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে সরকার, কংগ্রেস নাগরিক সমাজের দাবি মানলেও পরবর্তী পর্যায়ে বেগতিক দেখে কংগ্রেস নাগরিক সমাজকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে।

কংগ্রেস মুখপাত্র মনীশ তেওয়ারী আন্না-রামদেবকে আর এস এস- বিজেপির মুখোশ বলে কুৎসা রটাচ্ছেন। মনীশ সরাসরি বলেছেন, নেপথ্যে আর এস এস নাটকের পাঠ পড়ছে, আর আন্না মঞ্চে তা আওড়াচ্ছেন। মনীশদের এমন আচরণ সদৈব তাঁদের আর এস এস ভীতির পরিচয় দেয়। আন্না হাজারে বা রামদেবরা একটাই দাবি তুলেছেন—দুর্নীতি হটাও আর দেশে এক সৎ পরিচ্ছন্ন প্রশাসন আসুক। দুর্নীতি এদেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সৎ, পরিচ্ছন্ন সরকার, প্রশাসন-দেশের সমস্ত মানুষের এই প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু নাগরিক সমাজ ও তার নেতাদের গালমন্দ করে অস্বাভাবিকতাকেই বৈধতা দিতে চাইছে কংগ্রেস। চোরকে জেলে না পাঠিয়ে চোরদেরই পিঠ চাপাড়াচ্ছে।

নাগরিক সমাজের এই আন্দোলনের পিছনে আর এস এসের জুজু দেখে সরকারের ভয় পাওয়ার কী হয়েছে? অতীতে কংগ্রেস দেখেছে জয়প্রকাশের অহিংস আন্দোলনের ভয়াবহতা। সেই আন্দোলনকে চাপা দিতে মিসা, অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার মতো অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন কংগ্রেসের একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেত্রী ইন্দিরা। তুলনায় মনমোহন সরকার অনেক দুর্বল। সেই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের পিছনে ছিল আর এস এস। দেশের কল্যাণে বরাবরই আর এস এস ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। তা সে গুজরাটের ভূমিকম্পই হোক, বা অন্ধ্রের ঝড় বা একাত্তরের উদ্বাস্তু সমস্যায় সর্বত্র আর এস এসের ভূমিকা অনস্বীকার্য আবার দুর্নীতি দমনে নাগরিক সমাজের পিছনে আর এস এস।

নির্বাচন আর তিন বছর দূরে। সামনে কয়েকটা রাজ্যে নির্বাচন। মনমোহনের সাফল্যের লেখ-চিত্র ভূমি ছুঁয়েছে। বাজারদরে সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধিতেও মানুষ দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছে। তাই টিম মনমোহন নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে কলঙ্ক লেপনে যারপরনাই সচেষ্ট। 'Offence is the best defence' টিম সোনিয়ায় এক কৌশলী চক্রান্ত। লোকপাল বিল নিয়ে তাই এত আপত্তি।

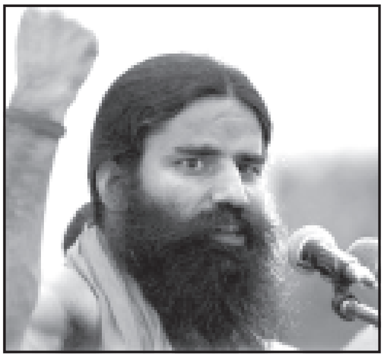

রামদেব ও আন্না হাজারের আন্দোলন

বাস্তবে কি উঠে এলো ?

অমলেশ মিশ্র

প্রাঞ্জল করে বলতে গেলে বর্তমান ভারতবর্ষ যে দুটি ঘটনায় উত্তাল, সেগুলি একটি উজ্জ্বল এবং একটি অন্ধকার দিক তুলে ধরেছে, একটিতে আশ্বস্ত হতে হয় অপরটিতে চিন্তিত। আমি যোগগুরু রামদেবজীর আন্দোলন এবং সমাজসেবী আন্না হাজারের আন্দোলনের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেশে দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচার সর্বকালীন সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে কেন্দ্রে এই সরকারের আমলে। দুর্নীতি রাজনীতিতে বা শাসন ব্যবস্থায় কোনও নূতন বিষয় নয়। কিন্তু তা যে সারা দেশের অর্থনীতিকে এই ভাবে বিপন্ন করবে এবং এত কোটি মানুষ অভুক্ত থাকবে ও পরিষেবা বিচ্যুত হবে একথা কিন্তু আগে ভাবা যায়নি বা এতবড় ঘটনা আগে ঘটেনি। জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় থেকেই দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। রাজীব গান্ধীর সময় বোফর্স কামান ক্রয়প্রসঙ্গে দুর্নীতির খবর পাওয়া গেছে। নরসীমা রাও সরকার টিকিয়ে রাখতে সাংসদ কেনা বেচা করেছিলেন জানা গেছে। কিন্তু বর্তমানের ২-জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস, আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি ঘটনার যে গভীর দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, আগে তা ছিল না। অ্যাতো বেপরোয়া দুর্নীতি! দেশের টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখার ঘটনা যে আগে ঘটেনি তা নয় কিন্তু সে টাকা যে এত লক্ষ কোটি হতে পারে তাও মানুষের ধারণার বাইরে ছিল।

আমরা যারা গণতন্ত্র বলতে ৫ বছর একবার ভোট দেওয়া বুঝি আমরা এসব মেনে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি রাজনীতি যারা করে তারা মুখে দেশের সেবার কথা বলে, আসলে নিজেদের বংশ পরম্পরায় আখের গুছায়। এটা মেনে নিতে হবে— এর প্রতিবাদ কে করবে? এর প্রতিবাদ করার জন্য যে গভীর দেশপ্রেমের রাজনীতি লাগে, তার দেখা পাওয়া যায় না। বড়জোর এই রকম হতে পারে যে— রামের পার্টি দুর্নীতি করেছে, শ্যামের পার্টি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করুক। শ্যামের পার্টি আন্দোলন করলে ভাল, জয়ী হলে ভাল। না যদি করে তাহলেও আমাদের করার কিছু নেই। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই রকম যে চুরি করার জন্য পার্টিকে লাগবে, আবার চুরির বিরুদ্ধাচরণ করতেও পার্টিকে লাগবে। পার্টি ব্যতীত কোনও কিছুই করা যাবে না।

রামদেবজী এবং আন্না হাজারে অন্ততঃ জনসাধারণকে এই আশ্বাস এবং উদাহরণ দিতে পেরেছেন যে পার্টিতন্ত্রের বাইরেও কিছু করা যায়।

এই দুই আন্দোলনের উজ্জ্বল দিক এইটাই। দেশের ভাল করার জন্য না হোক, দেশের মন্দ ঠেকানোর জন্য পার্টির বাইরে—পার্টিতন্ত্রের গণ্ডীর বাইরে আন্দোলন করা যেতে পারে।

বস্তুত রামদেবজী বা আন্না হাজারে-কে সরকার পক্ষ বা যে কেউ যতই বদনাম দিক, তারা একটা গণ আন্দোলন খাড়া করতে পেরেছেন এবং সরকার তাকে ভয় পেয়েছে। তারা যে ইস্যুগুলি তুলেছেন সরকার সেগুলি অস্বীকার করতে পারছেন না আবার স্বীকার করেও উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা বলতে পারছেন না। ভাসা ভাসা অকার্যকরী কিছু কথা বলছেন যার ফলে সরকারের উপর আরও অবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে। রামদেবজীর অনশন আন্দোলনে পুলিশী তাণ্ডব করতে হলো। এটা সরকারের ভয়েরই অভিব্যক্তি। তাকে নিবৃত্ত করার জন্য মন্ত্রীদের বিমান বন্দরে দৌড়াতে হলো। আবার বলছে, রামদেবের পিছনে বিজেপি এবং আর এস এস আছে। থাকেও যদি তাতে দোষটা কোথায়? রামদেবের পিছনে আর এস এস বা বিজেপি থাকলে কি কালোটাকার ব্যাপারটা মিটে যায়? শুধু পুলিশী তাণ্ডব নয়— রামদেবজীর সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এরফলে কি বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকা ফিরে আসবে?

আন্না হাজারে দেশের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার প্রসঙ্গে লোকপাল বিলের দাবী তুলেছেন। সরকার মেনেও নিয়েছে কিন্তু যা করা উচিত, যা করা প্রয়োজন তা করতে রাজী নয়। আন্না হাজারে তার মঞ্চের কাছাকাছি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলকে ঘেঁষতেও দেননি, তবু বলা হচ্ছে যে তিনি বিরোধীদের মুখোস। হাজারে যদি মুখোসও হন, তাহলেও সরকার নিষ্কৃতি পাবেন? এই দুই আন্দোলনের অন্ধকার দিকটি হলো সংসদীয় রাজনীতির বাইরে দেশের ভালমন্দের বিচার ভার চলে যাওয়া। রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক মানুষদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা এবং অবিশ্বাস ফুটে উঠা।

অত্যাচারী রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের প্রতি মানুষের ঘৃণাটা স্বাভাবিক কিন্তু। সংসদীয় রাজনীতির আবর্তে ও পরিমণ্ডলে জনমানসের এই ঘৃণা সংসদীয় রাজনীতির উপর আঘাত। কঠিন আঘাত। সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকারের উপর অরাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের উচ্ছ্বলতা গভীর ভাবে চিন্তিত করছে। গণতন্ত্র নাম হলেও আমাদের দেশ চলে রাজতন্ত্রের মতো। সরকার এবং মন্ত্রিসভা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা ভুলে— ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। তাকে খুশী রেখে তার পরিবারকে খুশী রেখে যত খুশী চুরি করা যায় যত খুশী কালো টাকা করা যায় ধরা না পড়া পর্যন্ত। এই চুরি-জোচ্চুরি দলও ধরে না, ধরে বিরোধী দল। এবং দলের লোকেদের সেই চুরি দায়িত্বহীন রাজার মতো গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করতে হয়, চাপা দিতে হয়, এড়িয়ে যেতে হয় এমন কি গণতন্ত্রের মূলে, পরিষদীয় রাজনীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে হয়। রাজতন্ত্রই যে এদেশের গণতন্ত্র এই দুই আন্দোলন সেই অন্ধকার দিকটাই তুলে ধরল।

অসম বিধানসভার নির্বাচনী ফল : এক অশনি সংকেত

বাসুদেব পাল

২০১১ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে ইসলামকেন্দ্রিক মুসলিম রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত অসমে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক দল এ আই ইউ ডি এফ (All India United Democratic Front) ১৮টি আসনে জিতে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এ এক অশনি সঙ্কেত। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত সারা ভারতেই (অখণ্ড) মুসলিমবহুল অঞ্চলে মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন-এর কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন। এর পরেও তৎকালীন নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে লোক-বিনিময় না হওয়াতে অবশিষ্ট ভারতে গড়ে উঠছে একের পর এক মিনি পাকিস্তান। আর অন্যদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান) ক্রমাগত হিন্দুশূন্য হচ্ছে। আজও সেখানে চলছে হিন্দুদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বর অত্যাচার। এই পরিপ্রেক্ষিতে অসমের দিকে তাকানো যাক।

২০০১-এর নির্বাচনে এ আই ইউ ডি এফ-এর নাম ছিল ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট। পরে এই নাম বদলের উদ্দেশ্য হলো কতিপয় অর্থগৃধ্নু ও ক্ষমতালিপ্সু হিন্দুদেরকে দলে স্থান দিয়ে দলের একটা তথাকথিত সেকুলার ভাবমূর্তি গড়ে তোলার। ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দল শুধু ১৮ জন বিধায়ককে বিধানসভায় পাঠিয়েছে তাই নয়, অন্য আরও কুড়িটি আসনে দলের প্রার্থী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিগত ২০০৬-এর নির্বাচনে সেরা দশ দশটি আসনে জিতেছিল। নির্বাচনের এই ফলাফলে রাজ্যের মূল নিবাসীদের আশঙ্কা বাস্তবায়িত হতে দেখা যাচ্ছে। একথা এখন আর আদৌ অবাস্তব নয়— যদি ২০১৬-র নির্বাচনে একটি মুসলিম রাজনৈতিক দল রাজ্যে সরকার গড়ার দাবী জানায়। মূলস্রোতের মানুষরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। বিশেষত— নিম্ন অসমের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া ও বরপেটা। মোট ১৩টি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশ ভালো। হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা গরিষ্ঠতার কাছাকাছি।

ধনকুবের আতর ব্যবসায়ী মৌলবী বদরুদ্দিন আজমল এ আই ইউ ডি এফ দলটির প্রতিষ্ঠাতা। সুপ্রীম কোর্ট আই এম (ডি টি) আইন বাতিল করার প্রতিক্রিয়ায় দলটির উদ্ভব হয়। রায়ে সর্বোচ্চ আদালত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল কীভাবে ওই আইনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে আগত বেআইনী অনুপ্রবেশকারীরা বহাল তবিয়তে অসমে বসবাস করে আসছে। অসমের ভূমিপুত্রদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল ওই আইনটি বাতিল করার। অথচ শাসক কংগ্রেস দল বরাবর ‘তাইরে-নারে’ করে তা কাটিয়ে দিচ্ছিল। কারও কারও মতে কংগ্রেসী আমলে হিতেশ্বর সাইকিয়ার মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ে সাইকিয়া মন্ত্রীসভার সদস্য (মুসলমান) আব্দুল মুহিব মুজমদার ওই বিলের মূল খসড়া রচনা করেছিলেন। কয়েক বছর পরেই আব্দুল মুহিব প্রকাশ্যে অসমকে মুসলমান রাজ্যে পরিণত করার ঘোষণা করেছিলেন। এটি মুসলিম মানসের শতবর্ষ প্রাচীন একটি ‘গোপন এজেন্ডা’ বলেই ওয়াকিবহাল মহলের সবাই জানেন। সাদুল্লা অসমের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে মুসলমানদের অসকে পুনর্বাসন দেন। বলা হোত ব্যাপক খাদ্যশস্য (Grow more food) উৎপাদন করার জন্যই এদের বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হচ্ছে। কেননা অসমে প্রচুর ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে। বাস্তবে তা ছিল ‘গ্রো মোর মুসলিম’ পরিকল্পনা এবং অসমকে মুসলিম বহুল রাজ্যে পরিণত করা। একটা স্লোগান চালু ছিল পূর্ববঙ্গে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে)— এপারে আল্লা, ওপারে আল্লা— চলো ভাই ও শালা যা করে আল্লা। প্রথম আল্লা ‘সলিমুল্লা’ (ঢাকার নবাব), দ্বিতীয় আল্লা (সাদুল্লা খাঁন) এবং শেষ ‘আল্লা’ মুসলমানদের উপাস্য।

তখনকার ভাইসরয়, লর্ড ওয়াভেল লিখেছেন, "The chief political problem is the desire of muslim ministers to increase this immigration into the uncultivated government lands under the slogan of 'Grow More Food' but what they are really after is 'Grow More Muslims'." মুসলমানদের মনের কথা অনুধাবন করতে এবং লিখে যেতে একটুও অসুবিধা হয়নি ইংরেজ ভাইসরয়ের। অথচ কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ‘রা কাড়েননি’। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য যে, ইউ পি এ সরকারের দু’ দফার প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং অসম থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য। তিনি তাঁর নামে হেমপ্রভা সাইকিয়ার বাড়িতে (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিধবা স্ত্রী) ঘরভাড়া নিয়েছেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ড. সিং বিশেষ বিমানে ভোট দিতে এসেছিলেন দিল্লী থেকে, এবার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভোটই দেননি। যদিও তাঁর সরকার প্রতিটি ব্যক্তিকে ভোটদানে উৎসাহ দিতে প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।

মুসলমান ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য মুসলিম সংস্থাগুলো যখনই বেআইনী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া ও বিতাড়িত করার কথা উঠতো, তখনই একেবারে তেড়ে রে-রে করে হৈচৈ শুরু করে দেয়। কংগ্রেস বরাবরই তোষণ নীতি অনুসরণ করে মুসলিমদের ধর্মীয় রাজনৈতিক লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে এসেছে ক্ষমতায় বসার স্বার্থে। তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন একটু সাহস দেখাতেই রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। তরুণ গগৈ সরকার এবার নির্বাচনের প্রাক্কালে ‘জাতীয় নাগরিক সূচী বা তালিকা (এন আর সি) আপ টু ডেট করার কাজ হাতে নিতেই পূর্বোক্ত মুসলিম সংস্থা ও দলগুলি বিরোধিতা করতে কোমর কষে ময়দানে নেমে বাধা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের চাপে পড়ে তরুণ গগৈ সরকার ওই প্রকল্পটি স্থগিত করে দেয়। মুসলমানদের উদালগুড়িতে পাকিস্তানী পতাকা

তোলার ঘটনাটা এক্ষেত্রে গগৈ-এর উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে।

যারা জাতীয় নাগরিক সূচী 'আপ টু ডেট' করার কাজে বাধা দিয়েছিল তারাই এবার মুসলিমবহুল এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনে তাদের পক্ষ সমর্থনকারীদেরই ভোট দিয়েছে। বরপেটা জেলায় এন আর সি-র বিরুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে রাস্তায় নেমেছিল 'অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' নামের উগ্র ইসলামী মুসলিম ছাত্র সংস্থা। সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম সংস্থাও ছিল। শাহবানু-খরপোষ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় শরিয়তী আইনের বিরুদ্ধে যাওয়ায় নেমেছিল। কেন্দ্রের রাজীব সরকার মুসলমানদের চাপে পড়ে আইন করে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে অকার্যকর করে দেয়। অপরপক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পাথরকুচি এবং সরভোগ-এ জয়লাভ করেছে। সঙ্কেত সুস্পষ্ট। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে যে সকল স্থানে মুসলিম মৌলবাদীরা সক্রিয় এবং প্রভাব বিস্তার করেছে তার লাগোয়া এলাকার হিন্দুরা ভয় পেয়েছে এবং বিজেপি-কেই সমর্থন করছে। এর আগে পাথরকুচি বিধানসভা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দল অসম গণপরিষদের ভালোমতো প্রভাব ছিল। সরভোগ বরাবর সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল। নিম্ন অসম এবং বরাক ভ্যালিতে মুসলিম রাজনীতির ডালপালা বিস্তার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে আরও বেশি করে সামনে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে ওই এলাকায়।

বাইরে থেকে এসে পাকাপোক্ত বাসিন্দায় (বাইরে মানে পড়ুন বাংলাদেশ) পরিণত হওয়া মুসলমানরা হিন্দুদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দিয়েছে। অসমের অনেকগুলি জেলাতে এই ঘটনা ঘটেছে। ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, নগাঁও, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে তারাই বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ভূমিপুত্র হিন্দুদের মনে নানা সন্দেহ ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ, গোয়ালপাড়া ও বরপেটা জেলায় মুসলমান নেতারা ভূমিপুত্র অসমীয়াদেরকে রীতিমতো হুমকি ও ভয় দেখিয়ে চলেছে। এলকার এক এ আই ইউ ডি এফ নেতা মুসলিমবহুল এলাকার জন্য স্বায়ত্বশাসিত পরিষদের (অটনোমাস কাউন্সিল) দাবী জানিয়েছে। এইখানেই অসমে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন যিনি মূল অসমীয়া ভূমিপুত্রদের স্বার্থানুসারী হবেন।

আবার অসমে অবৈধ অভিবাসী সমস্যা (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমান) অপেক্ষাকৃত কম। কিছুটা হলেও জনবসতিগত ভারসাম্য রয়েছে। এলাকায় উন্নতিও কিছু হয়েছে। এইক্ষেত্রে কংগ্রেস ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছে। তার ফলেই আসনসংখ্যা ৭৮-এ পৌঁছাতে পেরেছিল। এলাকাবাসী অবশ্য এটা অবহিত নন একথা বলা যাবে না যে, ওই বাংলাদেশী বেআইনী অভিবাসীরা এবার আবার অসমেও ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। এই সমস্যার বিষয়ে শীঘ্রতিশীঘ্র পদক্ষেপ গ্রহণের চূড়ান্ত আবশ্যকতা রয়েছে। উপর উপর না দেখে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেই নিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশীদের অভিবাসনকে কথার কথা ধরে নিয়ে গুরুত্ব না দিয়ে একচেটিয়াভাবে সমর্থন করে গেছেন অসমের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। দেবকান্ত বরুয়া (প্রয়াত এবং একদা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি) থেকে হিতেশ্বর সাইকিয়া এবং হালফিলের তরুণ গগৈ পর্যন্ত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। এরা কেউই অসমের মূল অধিবাসীদের এই বিপদ বিষয়ে প্রতিকারের দিকে যাননি। উল্টে বাংলাদেশী অভিবাসীদের সমর্থনই করে গেছেন।

এ জি পি (অসম গণপরিষদ) দলটি গঠিত হয়েছিল মূল অসমীয়াদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই। এই নির্বাচনে অসমবাসীরা তাদেরকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৯৮৫ সালে অসমবাসীরা দু'হাত উপুড় করে অগপ'র ঝুলি ভরে ভোট দিয়েছিল। এবার ভোটাররা অগপ-কে ময়দান থেকে উৎখাৎ করতেই ব্যাপক সংখ্যায় মতামত প্রদান করেছে। এবার অগপ প্রার্থীরা মাত্র দশটি আসনে জয়লাভ করেছিল। একই দল ১৯৮৫ ও ১৯৯৬-এতে ক্ষমতায় এসেছিল। ক্ষমতায় থাকাকালীন অগপ গুরুতর অবৈধ অভিবাসী (বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ) সমস্যা বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। আবার তারা যখন ওই অবৈধ অভিবাসীদের স্বার্থরক্ষাকারী দল এ আই ইউ ডি এফ (বদরুদ্দিন আজমলের দল)-এর মুসলিম নেতাদের সঙ্গে এক রহস্যময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে শুরু করেছিল। এই ঘটনা কংগ্রেসকে মূল অসমীয়াদের ভোট পেতে সাহায্য করেছিল। বিজেপিও অগপ-দলের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়ার কথা বলে বেকায়দায় পড়ে বাঙালী হিন্দুদের ভোট থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। অগপ থেকে মোহভঙ্গ হওয়াতে অনেকেই বিজেপি দলে এসে ভীড় করেছিল। তাদেরকে বিজেপি আশাহত করেছে। এখন যদি বিজেপি অগপ-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে তাহলে তারা কোথায় যাবে?

এছাড়া, কংগ্রেস বরাক ভ্যালিতে 'হিন্দু-কার্ড' খেলে বিজেপি'র জনসমর্থনের মূল ভিত্তিতে আঘাত হেনে নিজেদের অনুকূলে টেনে নিয়ে আসে। তরুণ গগৈ নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালী হিন্দুদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দেন। তরুণ গগৈ এর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে অগপ। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কীভাবে বাঙালী হিন্দুদের ভোট আশা করে? অগপ-র সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি'র ভোটভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যায়। সব মিলিয়ে অগপ-বিজেপি উভয়েই নির্বাচনে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়।

সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভার এই নির্বাচনে মুসলিম রাজনীতির উত্থান ভারতীয় জনতা পার্টিকে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি করে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য করে তুলেছে। কংগ্রেস এবং এ আই ইউ ডি এফ-কে মোকাবিলা করার জন্য বিজেপি দলকে তার হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে কিছু নির্ধারিত এলাকায় সংগঠিত করতে হবে। দল যদি হিন্দুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে তুলে ধরে তাহলে নিম্ন অসমে নিজস্ব হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক আবার ফিরে পেতে পারে। তবে আপার অসমে কিন্তু একই রণনীতি প্রযোজ্য হবে না।

একথা মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে 'হিন্দু ভোট'-এর উপর ভিত্তি করেই নির্বাচনে জিততে হবে। দু'রকম নীতি গ্রহণ করে হিন্দুভোটকে বিভ্রান্ত করলে নির্বাচনী সাফল্য অধরাই থেকে যাবে। মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে তার পরিণতি ভালো হবে না।

সরকারি প্রশ্রয়ে ডাক্তারী আসন বেচে কেরলে কোটি কোটি টাকার মুনাফা চার্চ কাউন্সিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অভ্যন্তরীণ চার্চ কাউন্সিল (আই সি সি)-এর সিদ্ধান্ত মেনে কেরলের ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউ ডি এফ) সরকার ঘোষণা করল চলতি শিক্ষাবর্ষে চার্চ কাউন্সিল পরিচালিত চারটি সেলফ ফাইন্যান্সিং মেডিকেল কলেজে স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর স্তরে সরকারী মেধা তালিকা'র অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবে না। বলা বাহুল্য বিরোধী লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের (এল ডি এফ) রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সরকার এহেন সিদ্ধান্ত অতি সহজেই নিতে পারল কারণ অভিযোগ উঠছে যে সরকার ও বিরোধী উভয়পক্ষেরই বেশ কিছু রাজনীতিবিদ তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্য কয়েকটি 'মেডিকেল আসন' কিনতে চাইছেন।

সরকারের এই ঘোষণার ফলে ৪০০টি এম বি বি এস এবং ৫৩টি পিজি আসনের সবকটিতেই নন-মেরিট বা ম্যানেজমেন্ট কোটার ভিত্তিতে ভর্তি নিতে পারবে চার্চ-কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলি। কিন্তু বিধিমতো অর্ধেক আসনে সরকারি মেধা-তালিকা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করার কথা কলেজ কর্তৃপক্ষের। প্রসঙ্গত, মেধা-তালিকা অনুযায়ী ছাত্র-ভর্তি হলে তার পড়াশুনোর খরচ বার্ষিক হাজার পঁচিশেক টাকার মধ্যে কুলিয়ে যাবে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোটায় পড়তে হলে সেই খরচের পরিমাণই তিন লক্ষ টাকায় পৌঁছে যাবে। তার ওপরে চার্চ কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হলে যে বে-আইনী ক্যাপিটেশন ফী (সাদা বাংলায় ঘুষ) দিতে হবে তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়, কম করে ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি পর্যন্ত হতে পারে তার পরিমাণ। আর প্রবাসী ভারতীয় (এন আর আই) কোটায় ভর্তি হলে ছাত্র পিছু বার্ষিক খরচ হবে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। সুতরাং সবমিলিয়ে, গরীব কিংবা নিদেনপক্ষে মধ্যবিত্ত তো দূরস্থান, খুব বড়লোক না হলে ওই মেডিকেল আসনগুলো ওরকম দাম দিয়ে কেনা একপ্রকার অসাধ্য।

প্রসঙ্গত, গত বছর স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার সময় এল ডি এফ সরকারের আমলে মোট আসনের অর্ধেক সরকারী মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে চার্চ কাউন্সিলের যে চুক্তি হয়েছিল তাও লঙ্ঘিত হলো। একইভাবে মেডিকেল কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়ারও এব্যাপারে যে একই নিয়ম রয়েছে লঙ্ঘিত হয়েছে তাও। চার্চ কাউন্সিলের অজুহাত, সরকার সময় মতো মেধা তালিকা প্রকাশ না করাতেই তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে নিয়ে আদালতে গেছে চার্চ কাউন্সিল। স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে রাজ্য-নিযুক্ত ফী রেগুলেটরি কমিটির সরকারী মেধা-তালিকার জন্য নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ মাসিক বেতনের ব্যাপারটিকেও সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছে চার্চ কাউন্সিল। সুতরাং কেরলের খৃস্টান সংগঠন ইন্টার চার্চ কাউন্সিলের ধৃষ্টতায় আর রাজ্য-সরকারের অপদার্থতায় শুরু হয়েছে মেডিকেলের আসন বিক্রি।

সন্দেহ হয়, ভবিষ্যতের এই 'ফ্যালো কড়ি, হও ডাক্তার'দের হাতে কতটা সুরক্ষিত কেরলের স্বাস্থ্য- ব্যবস্থা? চিকিৎসা-ব্যবসা গোটা রাজ্যটাকেই যদি গ্রাস করে নেয় তবে গরীব-মধ্যবিত্তরা আদৌ বেচে-বর্তে থাকতে পারবেন তো? যাঁরা কোটি খানেক টাকা খরচ করে ডাক্তারী ডিগ্রী কিনছেন তাঁরা নিখরচায় কিংবা যৎসামান্য পয়সায় বা সরকারী হাসপাতালে সস্তায় রোগী দেখবেন এমন আশা করা বৃথা।

চিঠিপত্র

মাঝরাতে রামদেবের উপর আক্রমণ

৪ জুন মাঝরাতে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে রামদেবের অনশন মণ্ডপে নিরীহ ও ঘুমন্ত জনসাধারণের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জসহ দমনপীড়নের দৃশ্য বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা গেছে। কিন্তু বেশিরভাগ বাংলা খবরের কাগজে খবরটিকে সেভাবে প্রচার করা হয়নি। একটি বাংলা কাগজ, যারা বলে থাকে যে তারা নাকি ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় করে না, তারা হেডলাইন দিল—'মহিলার ছদ্মবেশে পালাতে গিয়ে রামদেব ধৃত।' হঠাৎ এটা পড়ে মনে হবে যেন রামদেব একজন অপরাধীর মতো পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। আগের দিন কংগ্রেস মুখপাত্র জনার্দন দ্বিবেদী সাংবাদিক বৈঠকে রামদেবকে এভাবেই বিদ্রুপ করেছেন। তাই কাগজের ওই হেডলাইন যেন কংগ্রেসের মুখপাত্রের কথারই প্রতিধ্বনি। মনে হচ্ছে রামদেব ও আন্না হাজারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন! তাঁরা এখন রামদেবের নামে কুৎসা প্রচার ও তাঁর আশ্রম নিয়ে নানা রকম দোষ খুঁজতেই ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ খবরের কাগজ ও টি ভি চ্যানেল এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করছে যাতে রামদেবের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়। কিন্তু কেউ বলছেন না কংগ্রেসের 'অন্তরাত্মা' কেন এখনও চুপ করে আছেন। কেন প্রধানমন্ত্রী সেভাবে প্রকাশ্যে না এসে বললেন ওভাবে পুলিশী ব্যবস্থা না নিয়ে উপায় ছিল না? কেন উপায় ছিল না? রামদেবের ওখানে কি কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ চলছিল? কই সৈয়দ আলি সাহ গিলানী যখন রাষ্ট্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিলেন তখন তো পুলিশ এমন বীরত্ব দেখাতে পারেনি! সংসদ আক্রমণকারী আফজল গুরুকে কেন সরকার সুপ্রীম কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও সাজা দিতে পারছে না? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই! আসলে সবাই জানে যে গেরুয়ার ওপর অত্যাচার হলে সংখ্যাগরিষ্ঠরা কোনওদিন সমস্বরে প্রতিবাদ করবে না। আর পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির দায়ে জেলের বাইরে আছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামি সহযোগে সহনশীল গেরুয়াশিবিরকে নির্ভাবনায় আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তাই এঁদের ওপর দায়িত্ব সঁপে দিয়ে ম্যাডাম নিশ্চিন্তে দেশবিদেশে ঘোরাফেরা করছেন!

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটুলী, কলকাতা।

উর্দু দ্বিতীয় ভাষা?

গত ২৬ মে ২০১১ সন্ধ্যা ৭ টার বাংলা সংবাদ—ডিডি-১-এ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বললেন, (১) আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে আলিয়া মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়। (২) পশ্চিমবঙ্গের যেসব অঞ্চলে ১০ শতাংশ মুসলিম আছে, সেখানে উর্দু দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পাবে।

নির্বাচনের আগে মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যরা, আলিয়ার সঙ্গে মাদ্রাসা শব্দটি যোগ করার দাবীতে অনশন করলে, মমতা ব্যানার্জী নিজের হাতে তাদের সরবৎ খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, "আমি ক্ষমতায় এসে তোমাদের দাবী মেনে নেবো"। তিনি ক্ষমতায় এসে ৭ দিনের মাথায় এই দাবী পূরণ করলেন।

পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনও অঞ্চল নেই যেখানে ১০ শতাংশের বেশি মুসলিম নেই। তাহলে কি সারা পশ্চিমবঙ্গে উর্দু দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পাবে? এমন কোন দাবী বা প্রতিশ্রুতির খবর আগে শুনি নেই। তবে, ১৩ ফেব্রুয়ারী ময়দানে মুসলিম সমাবেশে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেছিল, 'মামাবাড়ি না কি? পশ্চিমবঙ্গে ১৭৬টি বিধানসভা আছে, যেখানে ২০ থেকে ৯৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার। আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক সমঝোতা মমতাকে করতেই হবে'। সুতরাং এমন কোনও গোপন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিনা, যে ক্ষমতায় এসে সব সমস্যা দূরে রেখে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, নেপালী, সাঁওতালী প্রভৃতি প্রথম ভাষার মর্যাদা পায়। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পেয়ে থাকে। উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা করলে ইংরাজীর কি হবে? বিষয়টি পরিষ্কার করে জানানো দরকার। তার আগে শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের মূল্যবান মতামত নেওয়াও দরকার।

বামফ্রন্ট সরকার, উর্দু একাডেমী বাধ্যতামূলক উর্দুশিক্ষা (মাদ্রাসায়) মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনাহীন অগ্রগতির নবদিগন্ত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি করেও এবারের নির্বাচনে তারা মুসলিম ভোট থেকে বঞ্চিত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রত্যাশা, তিনি সাম্প্রদায়িকতায় খেলবেন না।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল, নিবেদিতা পার্ক, কলকাতা।

পরিবর্তন

পরিবর্তনের পক্ষে আপনাদের পত্রিকার ভূমিকার জন্য এবং বিশেষভাবে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন যেন পরিবর্তনের উপর এক গণভোট। ভোটদাতারা দু-দলে বিভক্ত হয়েছিলেন—পরিবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে। পরিবর্তনের পক্ষে যারা ছিলেন তাঁরাই সংখ্যাগুরু। তাঁদের রায়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় এল বিনা রক্তপাতে। এটাই গণতন্ত্রের মহৎ গুণ।

কিন্তু একটা মূল বিষয় মনে রাখতেই হবে। এই পশ্চিমবাংলা মোট বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। দুই-তৃতীয়াংশের উপর ভারতবাসীর কোন অধিকার নেই।

পূর্ববাংলা ছিল পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী ব্যবস্থার উপত্যকায় অতি উৎকৃষ্ট উর্বর ক্ষেত্র। সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসতে হয়েছে। আমরা অনেকেই গঙ্গানদীর উপত্যকায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। কারণ ১৯৪৬ সালে যে ভোট বাংলায় হয়েছিল তা ছিল মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর পক্ষে যেন গণভোট। ৮২ শতাংশ বাঙ্গালী মুসলমান পাকিস্তান দাবীর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ("In that election, seen as a referendum on Pakistan, Bengali Muslim Voted 82 pecent in favour of Muslim League"—Encyclopedia of Asian History Vol. 1. p. 135)।

১২০৪ খৃস্টাব্দে বক্ত-ইয়ার খিলজীর বাংলা দখলের পূর্বে মুসলমান সমাজ বাংলায় ছিলই না। রাজা গণেশের (১৪১১-১৪) প্রায় চার বছর বাদ দিয়ে প্রায় ৫৫০ বছরের (১৭৫৭-১২০৪) মুসলিম রাজত্বের ফলে, ধর্মান্তরকরণের ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মাটিতে ভারতবাসীর আর কোনও অধিকারই থাকল না। ১৯৪৭ সাল থেকে। আমরা উদ্বাস্তু হলাম। এই প্রসঙ্গে সরস্বতী নদীর কাছে ঋগ্বেদের ভরদ্বাজ ঋষির একটি প্রার্থনা মনে পড়ল : হে সরস্বতী! আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি (ঋ. ৬/১২/১৪, অনুবাদক ড. রমেশচন্দ্র দত্ত)। ইতিহাসের এক একটি পদক্ষেপের সময়কাল এমনই দীর্ঘ যা খুব কম মানুষই মনে রাখেন। যেমন ১২০৪ থেকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ১৯৪৭। এখন গঙ্গার কাছে সেই একই প্রার্থনা—হে মা গঙ্গা! তোমার উপত্যকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যেন অপকৃষ্ট স্থানে ভবিষ্যতে চলে যেতে না হয়।

—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম, কলকাতা।

পণ্ডিত নেহরুর ভাবনাবিলাস

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে লেখা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৬.৩.১৯৫০ তারিখের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করে 'নিজস্ব প্রতিনিধি তাঁর প্রতিবেদনে (স্বস্তিকা, ১১.৪.২০১১) জানিয়েছেন—ছ' দশকেরও বেশি সময় আগেকার ওই চিঠিটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত চিঠিখানি অবশ্য প্রায় এক দশক আগে (জানুয়ারি, ২০০২) প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র 'বঙ্গসংহার এবং' গ্রন্থে (পৃ: ১৭৩-১৭৫) প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত, উক্ত গ্রন্থসূত্রে (পৃ: ১৭৭) সে সময় আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে লেখা জওহরলালের একটি কৌতুকপ্রদ ব্যক্তিগত চিঠির কথাও জানা যায়।

২০.৩.১৯৫০ তারিখের সেই চিঠিতে জওহরলাল তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মীকে লিখেছিলেন— 'বাংলার পরিস্থিতি ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকেও তিনি বিপন্ন মানুষের কাজে যখন লাগতে পারছেন না, তখন একজন 'সাধারণ মানুষ' হিসাবেই ওই মানুষগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চান'—("...The Bengal Situation in developing very dangerously for the future of India...I went to go back for a while to the people...")।

তাঁর ওই সিদ্ধান্তর কথা যে মন্ত্রীপরিষদকে খোলাখুলি ('frankly and quietly) বলেছেন এবং রাষ্ট্রপতিকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, সে কথাও জওহরলাল তাঁর চিঠিতে বিজয়লক্ষ্মীকে জানিয়েছিলেন এবং পাশাপাশি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি তখনই পদত্যাগ করছেন না ("...This does not mean that I am resigning immediately...I want to tell you not to worry at all...")। আমরা জানি, পণ্ডিত নেহরুর ওই মহৎ ভাবনা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি। তিনি আমৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি আঁকড়ে ধরে বসেছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়া

সুলেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপরোক্ত শিরোনামে ছোট্ট লেখাটি 'স্বস্তিকা'য় প্রকাশিত (৩০.৫.২০১১)। লেখাটি ছোট্ট গুরুত্বে প্রধান। কেননা তিনি স্বনামধন্য লেখক, তদুপরি মুসলমান এবং যে সকল তথ্যাদি ও যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, অকাট্য। সঙ্গত কারণে আগেই আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, রামকৃষ্ণের নামাজ পড়াটা একটা খেলো, অযৌক্তিক, অবিশ্বাস্য ও গালগল্প ছাড়া কিছুই নয়। সেই সিদ্ধান্তটি সৈয়দ সাহেব পোক্ত করলেন। তাঁর আশি পেরোনো বয়সে সত্য প্রকাশের সাহসের জন্য অসংখ্য সাধুবাদ। কিন্তু তাঁর উক্ত লেখার শেষ অনুচ্ছেদে যা লিখেছেন তাতে বড় রকমের একটা গোলযোগ আছে। তিনি লিখেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ নামাজ না পড়লেও 'যত মত তত পথ' এই ধর্মের প্রবক্তা। তাই প্রকৃত মুসলিমের পক্ষে তাকে শ্রদ্ধা করতে বাধা নেই।" এ সম্পর্কে আমাদের দুটি বক্তব্য :

১। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত মতে 'যত মত তত পথ'-এর প্রবক্তা বটে; কিন্তু এই কথাটি মোটেই ধর্ম নয়, রামকৃষ্ণদেবের একটি বাণী। তাও তিনি কী অর্থে কথাটি বলেছেন সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। আর এই বাণী মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। আল্লাহ, রসুল, কোরাণ ও হাদিসে বিশ্বাসীই প্রকৃত মুসলমান। এবং মুসলমানের ধর্ম ইসলামের ভিত্তি-আল্লাহ, রসুল, কোরাণ ও হাদিসের মতে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম স্বীকৃত নয়। ইসলাম ধর্মে আছে অন্য ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আছে অপর ধর্ম ও ধর্মানুসারীদেরকে হত্যা লুণ্ঠন কিংবা ধর্মান্তরকরণের জন্য জেহাদ (যুদ্ধ) ঘোষণা। আছে পৌত্তলিকতার ধ্বংস সাধনের জগৎ জোড়া উন্মাদনা। নবী মহম্মদ নিজে এই উদ্দেশ্যে ৮২টি যুদ্ধ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে করেছেন। নিজের হাতে কাবা মন্দিরের ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙ্গেছেন। এবং এযাবৎ মুসলমানরা এসব ঘৃণ্য কাজগুলি উৎসাহের সঙ্গে করে আসছেন।

রামকৃষ্ণ অন্যের চোখে যত মহৎই হোন তিনি প্রতিমাপূজক। ইসলামের চোখে অবশ্যই অপবিত্র পৌত্তলিক ও জাহান্নামের (নরক) ফতোয়া প্রাপ্ত (দেখুন কোরাণ ২/৩৯, ১৯৩; ৮/১২-১৩, ৩৯, ৫৫; ৯/৫, ১৪, ২২, ৮৮, ১১১ ইত্যাদি প্রচুর আয়াত)। এমতাবস্থায় প্রকৃত মুসলমান ইসলামের কঠোর নির্দেশ না মেনে পৌত্তলিক রামকৃষ্ণকে কীভাবে শ্রদ্ধা করবেন? আর যদি করেনও তবে তাঁর মুসলমানিত্ব কি বজায় থাকে?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কিংবা যে কোনও মুসলমান লেখক যদি আমাদের এই সোজা প্রশ্ন দুটির উত্তর দিতে পারেন এবং আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করতে পারেন তো খুশী হই।

—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

অসমের বদরপুরে রেলযাত্রী পরিষেবা

খুব ঘটা করে স্টেশনের দেওয়ালে লেখা আছে Safety, Security, Punctuality। শেষ শব্দটি উপহাস্যাস্পদ—সময়মতো বেশীর ভাগ গাড়ীই চলে না। করিমগঞ্জ স্টেশনে Enquiry No. 262010 লেখা থাকলেও অধিকাংশ সময়েই ওই ফোন কেউ ধরেন না। এমনকী স্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও স্পষ্ট করে জবাব পর্যন্ত দিতে চান না। সকালবেলা কিছু সময়ের জন্য প্রচার মাইক থাকে, বাকী সারা দিনরাত কোনও ব্যবস্থা নেই। সকালে দুল্লভছড়া থেকে ট্রেন করিমগঞ্জ এসে একই গাড়ী নম্বর বদল হয়ে শিলচর যায়। গাড়ীটার গার্ডের কামরা বাদে কোনও কামরা পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেই। গাড়ীটাকে প্রায়ই ক্রসিংয়ের জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যেটা অনায়াসে এড়ানো যায়। তাতে এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির সময় কিছু সাশ্রয় হয়। অনেক প্যাসেঞ্জার এই গাড়ীতে জরুরী কাজে শিলচর যান। দেরীতে পৌঁছানোয় অসুবিধায় পড়েন।

শিলচর থেকে ত্রিপুরাগামী গাড়ী দুটি প্রায়শই সময়মতো না ছাড়ার ফলে ত্রিপুরা থেকেও বিশেষত আগরতলা প্যাসেঞ্জার সময় মতো না ছাড়ায় যাত্রীরা খুবই অসুবিধায় পড়েন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অটো ও রিক্সাওয়ালারা।

পাঁচগ্রামে একদিকে কোনওমতে নামা ওঠার ব্যবস্থা আছে। প্রায়ই শিলচরগামী সকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি দ্বিতীয় লাইনে নেওয়া হয় যেখানে কোনও দিকে ওঠানামা করা খুবই কষ্টকর। সেরকম অবস্থা কাটাখাল জংশন স্টেশনেরও।

বদরপুর ভৈরবী গাড়ী সম্বন্ধে বলাটা বাহুল্য মাত্র— ছাড়া এবং স্টপেজের কোনও ঠিকানা নেই। বাথরুম আছে কিন্তু বেশীরভাগেরই দরজা জানালা নেই। জলও নেই।

—হরিসাধন কোণ্ডার, করিমগঞ্জ, অসম।

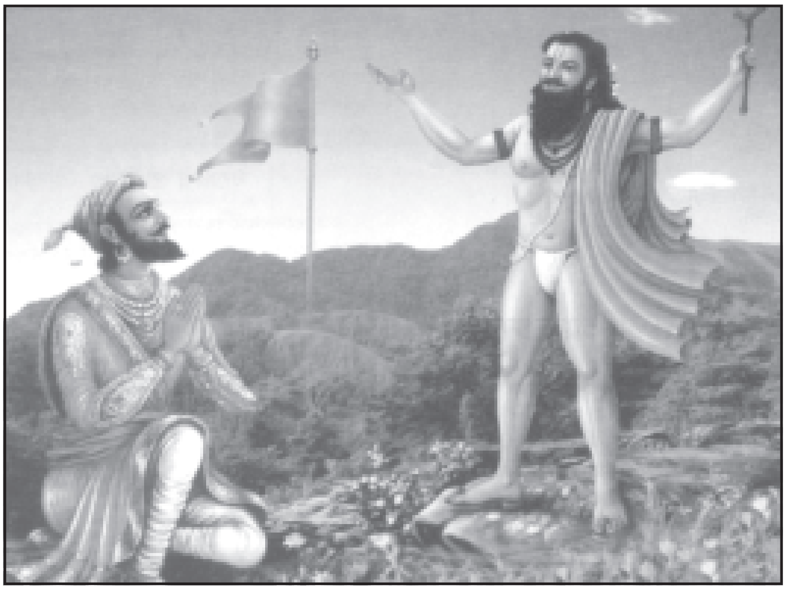

পরম্পরা

গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য এবং শিষ্য ও আচার্যের ভূমিকা

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম যে চারিটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো— জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ, আত্মার অবিনশ্বরত্ববাদ ও গুরুবাদ। ব্যক্তিজীবনে গুরু বা আচার্যের ভূমিকার কথা ও তাঁর উপদেশাবলীর প্রয়োজনীয়তার কথা ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল থেকে উপলব্ধি করেছে। তাই আচার্যকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে,— মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব তেমনি আবার বলা হয়েছে 'আচার্যদেবো ভব'। পিতা, মাতা, অতিথি এবং আচার্যকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান বলেছেন, গুরুকে আমারই স্বরূপ বলে জানবে—'আচার্য্যান্ মাং বিজানীয়াৎ'।

'গুরুপূর্ণিমা' পুণ্যতিথি। আষাঢ় মাসের পবিত্র পূর্ণিমাই গুরুপূর্ণিমা তিথিরূপে পরিচিত। জগদ্গুরু ভগবান ব্যাসদেব ওই তিথিতে নারায়ণের অংশে আবির্ভূত হয়ে আচার্যরূপে হিন্দুধর্মের প্রচার ও সংরক্ষণ করেছিলেন। মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে এবং শিষ্যপরম্পরার মাধ্যমে সেগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করে ব্যাসদেব মহান কীর্তি স্থাপন করেছেন। আজ পাঁচ হাজারেরও অধিককাল যাবৎ হিন্দু ধর্ম ওই ধর্মগ্রন্থগুলির দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আসছে। তাই হিন্দুসমাজ ব্যাসদেবের আচার্যত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর আবির্ভাব তিথিকে গুরুপূর্ণিমা তিথিরূপে পালন করে। ওইদিন আপন গুরুদেবকে ব্যাসাসনে স্থাপন করে গুরুপরম্পরা সহিত গুরুপূজা করা হয়ে থাকে।

জাগতিক বিদ্যা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত যে কোন বিদ্যা অর্জনের জন্যই শিক্ষক বা আচার্যের প্রয়োজন রয়েছে। আর ভারতের মহান পুরুষগণ বরাবর নিজেদের জীবনে আচার্য বরণের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। প্রাচীনকালে দ্বাদশ বর্ষ সকলকেই গুরুগৃহে অবস্থান করে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা (পারমার্থিক ও জাগতিক বিদ্যা) অর্জন করতে হোত। এবং উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আচার্যের আশীর্বাদ নিয়ে শিষ্য যৌবনকালে সংসার জীবনে প্রবেশ করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা গ্রহণ করতেন গুরুদেবের উপদেশ ও লাভ করতেন তাঁর পবিত্র সঙ্গ। তাই তখন ধর্মের ইঙ্গিতেই পরিবার ও সমাজ পরিচালিত হোত এবং স্বাভাবিকভাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল ধর্মরাজ্য।

রামচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব এসেছেন তাঁদের গুরুগৃহে নিয়ে যাবার জন্য। রাজা দশরথ বহুমূল্য বসন, দ্রব্যসামগ্রী ও রথের আয়োজন করেছেন রাজপুত্রদের পাঠানোর জন্য। বশিষ্ঠদেব বাধা দিলেন। রাজার পুত্র হলেও সাধারণ বসন পরে এবং পদব্রজেই যেতে হবে গুরুগৃহে অন্য বালকদের মতই। গুরুগৃহে সর্বপ্রকার বিদ্যা অর্জন করে পরবর্তীকালে রাজ্যভার গ্রহণ করেন রামচন্দ্র। রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র রাজ্যশাসন করলেও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন কুলগুরু ঋষি বশিষ্ঠ।

অত্যাচারী কংসকে বধ করে কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে মুক্ত করলেন কারাগার থেকে। কর্তব্য কর্ম সমাধা করে বালক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যাত্রা করলেন গুরুগৃহে। সন্দিপনী ঋষির আশ্রমে অবস্থান করে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, ফিরে আসলেন সংসার জীবনে এবং শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ও প্রেমের মাধ্যমে রাষ্ট্রজীবনকে ধর্মপথে চালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ং ভগবানও গুরুকরণের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন এবং গুরুগৃহে গুরু সেবার আদার্শ ও স্থাপন করেছিলেন। আবার আচার্য শংকর উপনয়ন সংস্কারের পর পাঁচ বছর বয়সে গিয়েছিলেন গুরুগৃহে অধ্যয়ন করতে। আট বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে উপনীত হলেন নর্মদাতীরে। গুরুদেব গোবিন্দপাদ তখন গুহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলে শংকর আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীগুরুর চরণে। দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন শংকর। পরবর্তীকালে একজন বলিষ্ঠ আচার্য ও ধর্মপ্রচারকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন শংকরাচার্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বালানন্দ মহারাজ সকলেই জীবনে আচার্যবরণ করেছিলেন এবং ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনায় পূর্ণতা অর্জন করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দেশমাতৃকার সেবায়।

'গুরু' শব্দের দ্বারা আমরা সাধারণত আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শককেই বুঝে থাকি। কিন্তু জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকে অন্তিম স্তর পর্যন্ত আমরা যাঁর কাছ থেকে সামান্যতমও কিছু শিখে থাকি তাঁকে গুরু বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে বিচার করলে পিতামাতা ও শিক্ষকবৃন্দও আমাদের কাছে গুরু স্থানীয়। তাঁদের উপদেশ ও শাসনের দ্বারাই সম্যকরূপে গড়ে ওঠে আমাদের জীবন। এরপর যদি কারুর মধ্যে ধর্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম পিপাসা জাগ্রত হয়, তাহলে সাধনার উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, অনুভূতিসম্পন্ন, সমর্থবান কোন আচার্যের চরণতলে

তাঁকে অবশ্যই উপনীত হতে হবে। মুণ্ডক উপনিষদে (১/২/১২) এ বিষয়ে খুব অপূর্ব উপদেশ আছে—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ স গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে জানবার জন্য সে (শিষ্য) হাতে সমিধ (হোমের কাঠ বা কোন

আবহমানকাল থেকে গুরু ও শিষ্যর মধুর সম্পর্কের ধারাই ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। একজনের আশ্রয়দান অপরের সমর্পণ, একজনের পথপ্রদর্শন, অন্যজনের আজ্ঞাবহতা-এর মধ্য দিয়েই অধ্যাত্মজ্ঞান ও রাষ্ট্রভক্তির সমন্বয় সাধন হয়েছে ভারতবর্ষে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য) গ্রহণ পূর্বক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করবেন। উপনিষদের এই মন্ত্রটির মধ্যে গুরু ও শিষ্যর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শিষ্যর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে, জাগতিক কোনও লাভের জন্য নয়। আর কেমন গুরুর কাছে যেতে হবে? শ্রোত্রিয় (শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞ) আচার্যর নিকট যেতে হবে। এরপর শ্রুতি বললেন, এই জ্ঞানবান গুরু তখন প্রশান্তচিত্ত, শমযুক্ত, সম্যকরূপে গুরুর অনুগত শিষ্যকে যে বিদ্যার দ্বারা সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা কৃপাবিদ্যা কৃপাপূর্বক উপদেশ করবেন মুণ্ডক উপনিষদ্ (১/২/১৩)। আচার্যের কৃপা ও উপদেশ ছাড়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মবিদ্যা 'ব্রহ্মবিদ্যা' অর্জন করা যায় না। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বললেন, 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'—যিনি আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তিই সেই পরমাত্মাকে জানতে পারেন। গুরু কোনও ব্যক্তিবিশেষ নন। গুরুশক্তি পরামাত্মারই একটি বিশেষ শক্তি যা কোনও ব্যক্তি, মূর্তি বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ একলব্যের জীবনের ঘটনা। ব্যাধপুত্র একলব্য অস্ত্রবিদ্ গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাকে অস্ত্রশিক্ষা দান করার জন্য। এবং এও জানালেন যে, দ্রোণাচার্যকেই তিনি অন্তরে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য অস্ত্রশিক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন একলব্যকে। একলব্য কিন্তু নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। অরণ্য মধ্যে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করে তিনি নিত্যপূজা করতেন এবং তাঁর সূক্ষ্ম আশীর্বাদ নিয়ে বাণ চালনা করতেন। গুরুশক্তির কৃপায় একলব্য দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের থেকেও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে উঠলেন। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্রোণাচার্য একদিন অনুসন্ধান করতে করতে উপস্থিত হলেন একলব্যের সাধন ক্ষেত্রে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছ, তোমার গুরু কে? একলব্য প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন, আপনিই তো আমার গুরু। তারপর আরাধ্য মূর্তির কাছে দ্রোণাচার্যকে নিয়ে গেলেন। অবাক হলেন দ্রোণাচার্য, বুঝলেন, গুরুশক্তিই মূর্তির মধ্য দিয়ে একলব্যকে বাণ শিক্ষা দিয়েছেন। আবার প্রতীক উপাসনার পদ্ধতিও স্বীকৃত আছে। দেশভক্তি ও ব্যক্তি চরিত্রের আধারে প্রকৃত মানুষ তৈরির কাজে যে প্রতিষ্ঠান ব্রতী আছে সেই 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' কোনও মানুষকে নয়—গৈরিক পতাকাকে গুরু হিসাবে মান্যতা দিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, পরম্পরা, ত্যাগ, তপস্যা ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক ওই পতাকা। তাই সংঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতিদিন গৈরিক পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে ভারতমাতার প্রার্থনা করেন এবং দেশভক্তি ও আদর্শ চরিত্র গঠনের শিক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে এবং ওই তিথি উপলক্ষে কয়েকটি দিনে পুষ্পার্ঘ দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন ও দক্ষিণা প্রদান করেন স্বয়ংসেবকগণ।

গুরু কেবল অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শক নন তিনি রাষ্ট্রভক্তির ক্ষেত্রেও প্রেরণা দান করে থাকেন। শিবাজী গুরুদেব রামদাস স্বামীর প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য শাসন করতেন। গুরুদেব নিজের উত্তরীয় দান করে বলেছিলেন, 'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও'—ত্যাগ ও দেশপ্রেমই তোমার রাজ্যের আদর্শ হোক। শুধু উপদেশ বাণী নয়, দেশের যে কোনও সঙ্কটে এমনকি মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও সহযোগিতা করেছেন রামদাস স্বামী, আবার কখনও বা শিষ্য শিবাজীকে প্রেরণা দান করেছেন হিন্দুরাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে। গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ সম্প্রদায়ের দশম আচার্য গুরু গোবিন্দ সিং যেমন অধ্যাত্মসাধনায় একজন দিকপাল ছিলেন, আবার ত্যাগী দেশভক্ত বীর শিষ্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, ঘোষণা করেন যুদ্ধযাত্রা। দশমগুরু গোবিন্দ সিং-এর পরে কোনও ব্যক্তি শিখ ধর্মের গুরু হননি। সেই গুরুর স্থান গ্রহণ করেছে 'গুরুগ্রন্থসাহেব'। সকল ধর্মের সার বস্তু নিয়েই রচিত হয়েছে গ্রন্থসাহেব। আজ পর্যন্ত গ্রন্থসাহেবই শ্রীগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী রামদাস বা গুরুগোবিন্দ সিং-এর কাছে আজও ভারতবর্ষ অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানায়। প্রাচীনকালে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি এবং বর্তমানকালে রামদাস স্বামী, গুরুগোবিন্দ সিং, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শংকরাচার্য, ভগবান বুদ্ধ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এভাবেই ব্যক্তিজীবন তথা রাষ্ট্রজীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আচার্যের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

আবহমানকাল থেকে গুরু ও শিষ্যর মধুর সম্পর্কের ধারাই ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। একজনের আশ্রয়দান অপরের সমর্পণ, একজনের পথপ্রদর্শন, অন্যজনের আজ্ঞাবহতা-এর মধ্য দিয়েই অধ্যাত্মজ্ঞান ও রাষ্ট্রভক্তির সমন্বয় সাধন হয়েছে ভারতবর্ষে।

(গুরুপূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

শ্রী গুরুপূর্ণিমা ও আর এস এস

বাসুদেব পাল

যেমন বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব পালন করে তেমনই এদেশের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী হিন্দু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব পালন করে আসছে প্রতিষ্ঠার প্রায় সূচনাকাল থেকে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই (মৃত্যু—১৯৪০) সঙ্ঘের মূল কার্যপদ্ধতি বা নীতি-নিয়ম ঠিক করে যান।

এদেশের ভূমিপুত্ররূপী হিন্দু সমাজ যে পবিত্র হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে যুগ যুগ যাবৎ বসবাস করে আসছে তা সনাতন (হিন্দু) ধর্ম বলে স্বীকৃত এবং অপৌরুষেয়। সেই হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজ করে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এদেশের চিরন্তন শাশ্বত আদর্শ হলো ত্যাগ। আর ত্যাগের প্রতীক সুবর্ণ গৈরিক। এদেশের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা সেই সুবর্ণ গৈরিক রঙের পোষাক পরেন। সকালবেলা যখন সূর্যোদয় হয় তখন তার রঙও গৈরিক। উদীয়মান সূর্য রাত্রির অন্ধকার দূর করে। গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী গুরুরা শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘের গুরু হিসেবে সেই গৈরিক পতাকাকেই স্বয়ংসেবকদের সামনে রেখেছেন।

বিশাল সংগঠনের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবককে যুগ যুগ ব্যাপী পথনির্দেশ করা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা ব্যক্তি মাত্রই মরণশীল, এতদ্‌সত্ত্বেও কোনও ব্যক্তিবিশেষের গুরুকরণের বিরোধী নয় সঙ্ঘ। ব্যক্তিজীবনে মোক্ষমুক্তির জন্য যে কেউ গুরুকরণ করতে পারেন। তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও লৌকিকতা প্রদর্শন করেন স্বাভাবিকভাবেই।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ভারতবর্ষব্যাপী সতত সক্রিয়। সঙ্ঘ তার সাংগঠনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনও সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য কদাপি গ্রহণ করে না, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই নিজেদের কষ্টার্জিত উপার্জনের অংশ থেকেই সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে সেই অভাব পূরণ করেন। অনেকে সাধ্যের বাইরেও কষ্ট করে সাংগঠনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য হাত উপুড় করে অর্থ প্রদান করেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে গৈরিক পতাকাকে পূজন করে সেই অর্থ সমর্পণ করতে হয়।

এই অনুষ্ঠানের নাম শ্রীগুরুদক্ষিণা উৎসব। এটা গুরুপূর্ণিমা উৎসবের অঙ্গ। এটা সংগঠনকে সাহায্য বা চাঁদা দেওয়া নয়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এটাকে দেশ, সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ ও কর্তব্যরূপী 'সমর্পণ' বলেই দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন। এটাই সঙ্ঘের মত বা স্বয়ংসেবকদের সংস্কার। বেশি হলে এটাকে আমরা যে সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত তার জন্য ব্যক্তিগত সমর্পণ ও ঋণশোধ বলে মনে করা হয়। ঋষি ঋণ ও রাষ্ট্র ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য হলো আমাদের সকলের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করা।

সেজন্য প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে দৈনন্দিন সঙ্ঘ কাজ অর্থাৎ সঙ্ঘ শাখায় দেশের জন্য সমর্পণের সংস্কার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তার ফলেই স্বয়ংসেবকরা কোনওরকম ভেদাভেদ ছাড়াই দেশ, ধর্ম ও সমাজের কল্যাণে কাজ করার প্রেরণা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে দেশের বিপর্যয়, তা মনুষ্যসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক যাই হোক না কেন—স্বয়ংসেবকরা তার পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের দেশভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীগুরুদক্ষিণা তারই একটা দিক মাত্র।

অঙ্গনা

নারী আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে

বিদিশা ভট্টাচার্য

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।।

প্রাচীনকাল থেকেই নারীর মধ্যে এই দুটো রূপ সমানভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ একাধারে মাতৃরূপ ও অন্যদিকে শক্তির দ্বারা বিনাশ সাধন। দিনে দিনে নারীর এই শুভ শক্তি, অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে চলেছে।

২০১১ সালের নারী-পুরুষদের অনুপাত দাঁড়িয়েছে, ৯৩৩ থেকে ৯৪০। সারা ভারতে যা এক দশকে ৯২৭ থেকে কমে ৯১৪ হয়েছে। আমরা যদি প্রাচীন ইতিহাসের পাতা হাতড়াই, তাহলে দেখতে পাব যে, গুপ্ত যুগে-মৌর্য যুগে প্রভৃতি সময়কাল-এ নারীদের হয়তো কিছুটা হলেও মর্যাদা দেওয়া হোত। কিন্তু সেই মর্যাদাবোধ বা অধিকার বোধের মধ্যে দণ্ডী কেটে দেওয়া হোত। যাতে তারা কখনই না পারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পতন ঘটাতে। নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ; এও কী খুব দরকার?

তাই আজও অনেক ঘরে কন্যা সন্তান জন্মালে সেই জননীকে রাক্ষসী অপবাদ শুনতে হয়। কিংবা শাঁখ বা উলু বাজানোরও কেউ থাকে না। তাঁকে নিয়ে বাড়ীতে যেন শোকের ছায়া! কেন? কেন এই বৈষম্য? অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেটস বলেছিলেন, ‘‘আর্থিক উন্নতির ফলে আয় যতক্ষণ না একটা নির্দিষ্ট চৌকাঠ পেরোবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৈষম্য বাড়তেই থাকবে।’’

জীবনের চাকা সময়ের মতোই পরিবর্তনশীল। সেও ক্রমঘূর্ণমান। তাই মনে পড়ে যায় বিখ্যাত শিল্পী সলিল চৌধুরীর সেই গানটি :

‘‘এই রোকো পৃথিবীর গাড়ীটা থামাও,
আমি নেমে যাব;’’

এই কথাটা বলার বোধহয় সময় এসে গেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই পুরুষ সম্রাটদের। তাদের কোনও চক্রান্ত করে নয়, স্ব-ইচ্ছায় তারা সরে যাচ্ছে। এ কী সম্ভব শুধু তেজস্বিনী নারীদের জন্য! যারা অনেককাল অবহেলিত, পীড়িত, জর্জরিত কাতর অবস্থাকে কাটিয়ে উঠেছে। আজ তারা শীর্ষে। তাদের মধ্যে ছিল জ্বলন্ত বারুদ। এইসব ঘটনাগুলো শুধুমাত্র তাদের মনের মধ্যে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে।

দিন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই আজকের নারীরা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দিক দিয়ে আমাদের দেশে মেয়েরা লেখক বা শিল্পী হতে চাইলে তাদের পদে পদে বাধা আসে। সাংসারিক কারণে ও স্বামীদের অসহযোগিতার জন্য তাদের লেখক, শিল্পী হওয়ার বাসনাকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। অধিকাংশ প্রতিভাই এভাবে নষ্ট হয়ে যায়— এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার মনে হয়, এই সুন্দর জীবনকে তখনই পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে তোলা যায়, যখন সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে তোলা হয়। অভিজ্ঞতা মানুষকে ঋদ্ধ করে। জীবনের প্রতিটি ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু-না- কিছু স্মৃতি থেকে যায়। সেই স্মৃতি নানাভাবে ঘুরে আসে সাহিত্য সৃষ্টির পরতে পরতে। তাই বোধহয় মনে পড়ে যায় সেই মাধবী কুট্টি ওরফে কমলা দাস বা কমলা সুরাইয়ের কথা। তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

‘‘নিজের যোগ্যতার উপর আত্মবিশ্বাস রাখা উচিত। নিজেকে প্রথমে একজন আদর্শ স্ত্রী ও মা করে তোলা উচিত। তারপর আত্মপ্রতিষ্ঠা। সেটা একটা দীর্ঘ পথ। অপেক্ষা করে যেতেই হবে। তবেই সাফল্য। তাছাড়া, ছবি আঁকার মধ্যে ফুটে ওঠে হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা স্বপ্ন, ডানা মেলে ফুটে ওঠে ক্যানভাসে।’’ তাই তিনি পেরেছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত থেমে থাকেনি তাঁর কলম।

আবার অন্যদিকে আমরা দেখি, বিখ্যাত সেই মহীয়সী মহিলা হেলেন কেলার-কে। ভাগ্যের পরিহাস তাঁর থেকে সব কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্বর্ণভাণ্ডারতুল্য প্রতিভা তাঁকে পরিচিত করে তুলেছে আমাদের মধ্যে। দৃষ্টিহীন, বাকক্ষমতাহীন, শ্রবণক্ষমতা নেই, তা সত্ত্বেও তাঁর অভুতপূর্ব সৃষ্টি বুঝিয়ে দেয় বর্তমান নারী সমাজকে, মানসিক শক্তি হলো এমন এক জাদুকাঠি যা শারীরিক সব অক্ষমতাকে এক নিমেষে উড়িয়ে দিতে পারে।

তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় বোধহয় উঠে আসে দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো মহিলার নাম। যার লক্ষ্য শুধুই ‘বুলস আই’-এর হলুদ। জীবনের উন্নতির তীরকে লক্ষ্যভেদ ছোঁয়া। তাহলেই কেল্লাফতে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান, সোনার পদক বিজয়ী এককথায় আমাদের ঘরের সোনার মেয়ে।

শুধু এতেই থেমে নেই আধুনিক ললনারা। মার্কিন মুলুকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এভারেস্টের চূড়ায় উঠে প্রমাণ করছে যে তারাও পারে, শিক্ষার দিক থেকেও তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। জয়ন্তী হাসঁদা, অথবা শ্রাবণী কোনাই দৃষ্টিশক্তি না থাকা সত্ত্বেও বাংলায় লেটার মার্কস পায়, এবং উচ্চশিক্ষায় সমান আগ্রহী। আমরা দেখেছি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকেও নারীদের সাফল্য।

আমাদেরই এই বঙ্গতনয়ারা কারোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেতে চায় না। শুধু পদদলিত হয়ে থাকতে নারাজ। তারা তাদের স্মরণে-মননে নিজেদের একটু সম্মানের আসনে বসাতে চায়। তারা কারোর মেয়ে নয়, তাদেরও নিজস্ব সত্তা আছে। তারাও পারে। স্ব-সম্মানে নিজেকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে তারা পারবে অর্থাৎ আমাদের আধুনিক নারী সমাজকে অনেক পথ এগোতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন মানসিক জোর। কতদিন তারা আর নিদ্রাচ্ছন্ন থাকবে? কুসংস্কারের গণ্ডি ভেঙে তাদেরকে জেগে উঠতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে। যদি সব নারীর মধ্যে এই চেতনাকে জাগানো যায়, তাহলে সত্যিই জগৎসভায় নারীর আসনই শ্রেষ্ঠ হবে। তারা উচ্চস্বরে বলবে—‘‘আমরা করব জয়, নিশ্চয়!’’

সীমান্ত জনকল্যাণ সমিতির সম্মেলন

সীমান্তে প্রহরারত সদাজাগ্রত সৈনিক যেন উপলব্ধি করে সীমান্তে যে তাদের পিছনে বসবাসকারী জনসমাজ প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনকে তুচ্ছ করে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। সুতরাং সীমান্তে বসবাসকারী মানুষদের দেশের প্রতি স্বাভিমান সম্পন্ন, সৎচরিত্র দেশপ্রেমী ও সংস্কারিত করতে পারলে সীমা জনকল্যাণ সমিতির এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে জনকল্যাণ সমিতির দক্ষিণ বঙ্গের কার্যকর্তা বৈঠকে এই মত পোষণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্বক্ষেত্রীয় প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত। তিনি আরও বলেন, রাখী বন্ধন, শক্তিপূজা ও ভারতমাতার পূজার মাধ্যমে সীমা সুরক্ষাবল (বি এস এফ) সৈনিক ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সীমা সংযোজক রাকেশ সিংজী, পূর্ব ক্ষেত্রীয় সংঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমিতির সহ সভাপতি অধ্যাপক প্রলয় তলাপাত্র প্রমুখ। দক্ষিণবঙ্গের ২৭ জন কার্যকর্তা এবং উত্তর বঙ্গের প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন।

রাকেশজী পাকিস্তান ও নেপাল সীমান্তে কাজের বিবরণ দেন, দক্ষিণবঙ্গের কাজের অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সাগর সীমা—নিম্ন হাসনাবাদ থেকে কাঁথি জেলার দীঘা পর্যন্ত অসংরক্ষিত। ফলে 'চীন' বিনা শুল্কে এই পথে তাদের পণ্যসামগ্রী আমাদের দেশে প্রবেশ করাচ্ছে। কোনও অজানা কারণে প্রশাসন নীরব।

দক্ষিণবঙ্গ বাংলাদেশ সীমা প্রায় ১০২০ কিমি। কিছু অংশ ডাঙ্গা বাকি ইছামতী নদী, এই বিরাট লম্বা সীমা দেশবাসীর সহায়তা ছাড়া শুধুমাত্র সৈনিকদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেকথা স্মরণ করিয়ে দেন আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, সীমান্তের এক একটি গ্রাম হবে দেশভক্ত গ্রামবাসীদের একটি 'সীমা চৌকি' এবং প্রতিটি যুবক হবে গ্রামচৌকির 'সদাজাগ্রত সৈনিক'। বারাসাত ও বসিরহাট জেলার পরিচালন সমিতির নাম ঘোষণা করা হয়। বৈঠক সমাপ্তিতে অধ্যাপক প্রলয় তলাপাত্র সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতীদের সংবর্ধনা দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থে

উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় রাজ্যে প্রথম স্থানাধিকারী সহ আরও দুই কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল কোচবিহার জেলার দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যালয়। গত ১৬ জুন প্রথম স্থানাধিকারী সৌমেন সাহা, ষষ্ঠ নিবেদিতা রায় এবং দশম জয় সাহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য উত্তম রায় এই কৃতীদের শুভেচ্ছা জানান। উত্তরবঙ্গ বিদ্যাভারতীর সভাপতি সত্যপদ পাল বলেন, এই কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ভিত তৈরি হয়েছে প্রথম সারদা শিশুতীর্থ মদনমোহন পাড়ায়। বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সম্পাদক ক্ষিতিশ সরকার বলেন, স্বাভাবিক ভাবে উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়গুলিরও নাম ছড়িয়ে পড়বে। সর্বশেষে উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা করেন। অনুভব কথনে এই তিন কৃতী ছাত্রছাত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারদা শিশুতীর্থ মদনমোহন পাড়া দিনহাটার ভূয়সী প্রশংসা করে। পরিশেষে মোহনানন্দ আশ্রমের মহারাজ শ্যামল ব্রহ্মচারী এই তিন কৃতীদের আশীর্বাদ দেন।

পাঁচলা খণ্ডে সঙ্ঘ পরিচিতি বর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার ডোমজুড় মহকুমার অন্তর্গত পাঁচলা খণ্ডের যোজনায় ওই খণ্ডের সঙ্ঘ পরিচিতি বর্গ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ৫ জুন সারাদিনব্যাপী এই কার্যক্রম চলে। সঙ্ঘকে জানার আগ্রহে ৪০ জন একেবারে নতুন যুবক এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমে হুগলী বিভাগ কার্যবাহ তাপস ভট্টাচার্য এবং হাওড়া জেলাকার্যবাহ দীপঙ্কর নস্কর উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রষ্টাচার মিটাও সত্যাগ্রহ

স্বামী রামদেবের আহ্বানে ৪ জুন থেকে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে শুরু হওয়া অনশন সত্যাগ্রহের অনুকরণে পঞ্চুরচকে অনশন শিবির আয়োজিত মেদিনীপুরে হয়েছিল। ওইদিন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন ও ভাষণ দেন। বিশেষ উল্লেখ্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি (বিদেশ বিভাগ) বালকৃষ্ণ নায়েক উপস্থিত থেকে অনশন সত্যাগ্রহীদের মার্গদর্শন করান। ৪ জুন মধ্যরাত্রে দিল্লীর অনশন শিবির পুলিশ ভেঙে দেওয়ার পরও এখানে একইভাবে শিবির চলেছিল।

উত্তরবঙ্গে সমাজ সেবাভারতী

সমাজসেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নানাধরণের সেবা কাজ করে চলেছে। যেমন শিশু সংস্কার কেন্দ্র, পাঠদান কেন্দ্র, ধর্মসভা, ভজনমণ্ডলী, রক্তদান শিবির, সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র, কম্পিউটার কেন্দ্র, হোমিও দাতব্য সেবা কেন্দ্র, আরোগ্য মিত্র তৈরি করা, ঝোলা পুস্তকালয় ও দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গত সাধারণ সভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত সংগঠনের কাজকে উত্তরবঙ্গে বিস্তারের পরামর্শ দেন। এই উদ্দেশ্যে গত ১৮ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত সঙ্ঘের প্রচারক ও সমাজ সেবাভারতীর কার্যকরী সমিতির সদস্য ডাঃ সনৎ কুমার বসু মল্লিক ও সম্পাদক ডাঃ গোপাল চন্দ্র কর উত্তরবঙ্গে কিছু স্থানে ভ্রমণ করেন। রায়গঞ্জে সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক ও সেবা প্রমুখের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ২০ জুন শিলিগুড়িতে সেবাভাবী কার্যকর্তাদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, শিলিগুড়িতে সমাজ সেবাভারতীর মাধ্যমে সেবা কাজ করা শুরু হবে। এজন্য ৭ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্থির হয় প্রথমে একটি পাঠ্য-পুস্তক লাইব্রেরী স্থাপন করা হবে।

শোক সংবাদ

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নগর ব্যবস্থা প্রমুখ গোপীনাথ কর এর মাতৃদেবী বিজনবালা দেবী (৮০) গত ৪ জুন পরলোক গমন করেছেন। তিনি ৪ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

***

বাঁকুড়া জেলার মোলবনা শাখার স্বয়ংসেবক তথা সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য বাবলু মণ্ডলের পিতৃদেব রবি মণ্ডল (৭০) গত ২৪ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তিনি দুই পুত্র ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

***

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জীবনকান্তি রায় গত ১৬ জুন দুপুরে পরলোক গমন করেন। তিনি শাখার শারীরিক এবং ঘোষে (বাদ্যে) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুকালে রয়স হয়েছিল ৭০ বছর। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দুই নাতনী বর্তমান।

***

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নগরের স্বয়ংসেবক শ্রীমলয় বনিকের পিতা সুবলচন্দ্র বণিক গত ২৪ জুন, ৭২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর তিন পুত্র, স্ত্রী, পুত্র বধূ এবং এক নাতনী বর্তমান। তিনি শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন।

অন্য রকম

তিহার জেলবন্দীদের তৈরি কনফেকশনারি দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতার একটি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদক সংস্থার মালিক জেলে যান নিজের প্রতিষ্ঠানে লাগোয়া জমি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এক অপরাধে। দোকানের লাগোয়া চায়ের দোকান অসুবিধে ঘটছিল ব্যবসা বিস্তৃত করার কাজে। সাধারণভাবে কথাবার্তায় কাজ না হওয়ায় ব্যবসায়ী এক পেশাদার অপরাধীকে ভার দেন চাওয়ালাকে সরিয়ে দেওয়ার। কাজ ঠিকমতো হলেও কোনও গোলমালে সব জানাজানি হয়ে যায়। খাদ্য-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মালিক আইনের আওতা থেকে রক্ষা পাননি। তিনি জেলে যেতে বাধ্য হন। জেলের সব কাজকর্ম দেখে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কারাগারে থাকা অপরাধীদের দিয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের। উপকরণ, যন্ত্রপাতি তিনি সরবরাহ করবেন। জেল বন্দীদের উৎপাদন পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। আর উৎপন্ন সমস্ত সামগ্রী কিনে নেবে তাঁর সংস্থা। এমন প্রস্তাব কারাবিভাগ বিবেচনাধীন রাখে। পরে তা এগোননি।

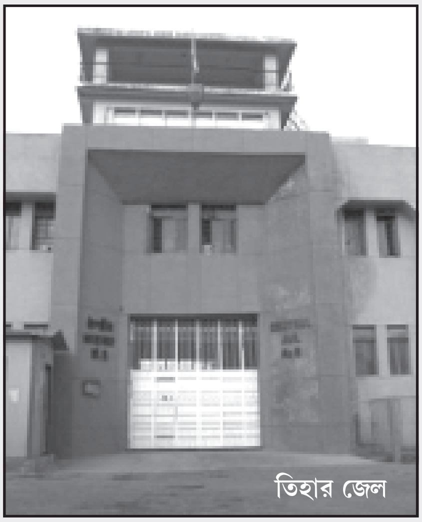

তিহার জেল

ক'দিন আগে খবর দেখা গেল। তিহার জেলের বন্দীরা বেকারি দ্রব্য উৎপন্ন করছেন যা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে রাজধানীর কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে। টিজে নামে উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে আছে আলুভাজা, বিস্কুট, নিমকি, কেক ইত্যাদি জিনিস। খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে সরকারি সংস্থায়। ২২টি কেন্দ্রীয় স্টোর্সে। যার পরিচালক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ কনজিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।

যাতে টি জি ব্রাণ্ডের সব উৎপন্ন সামগ্রী সমস্ত কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে পাওয়া যায় তা দেখা হচ্ছে। জেলে তৈরি খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে এবং সেই চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে— একথা জানিয়েছেন তিহার জেলের ল' অফিসার ও মুখপাত্র সুনীল গুপ্ত। এখন সাতটা জায়গা থেকে টি জি ব্রাণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ২৯। পাঁচ রকমের নিমকি, বিস্কুট, কেক, পাঁউরুটি, ওয়েফার পাওয়া যাচ্ছে। আরও অনেক ধরনের জিনিস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তাতে জেলবন্দীদের কাজের সুযোগ আরও বাড়বে। তাঁরা আয়ও করতে পারবেন। এর ফলে জেলবন্দীদের পুনর্বাসন কর্মসূচিকে ঠিকভাবে রূপ দেওয়া সহজ হবে।

খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে গত বছর জেল ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। সুনীল গুপ্ত বলেছেন আমরা বৃহত্তর ক্রেতাসমষ্টির কাছে পৌঁছোতে চাই। সেজন্যে আমরা সমস্ত কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারের বিক্রয় ব্যবস্থার আওতায় আমাদের সামগ্রীকে আনার ব্যবস্থা করছি। এবছর আমরা তিন কোটি টাকার ব্যবসা করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য আছে বার্ষিক বিক্রিকে ১৫ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার। সেজন্যে প্রচার দরকার। উৎপন্ন সামগ্রীর প্রচার এফ এম রেডিওর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

তিহার জেলে যেটা সম্ভব হলো সেটা কলকাতা বা আশপাশের কারাবন্দীদের দিয়ে করানো গেল না কেন?

হায় ফিদা হোসেন, হায় ফিদা হোসেন !

শিবাজী গুপ্ত

রাজা কাঁদে মন্ত্রী কাঁদে
কাঁদে সভাসদ।
কান্নার জোয়ারে ভাসে
গিরি নদী নদ।।

বিখ্যাত নগ্নচিত্র বিশারদ মকবুল ফিদা হোসেনের এন্তেকাল হয়েছে পরিণত বয়সে। তিনি ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। কিন্তু ভয়ে বিলাতে স্বেচ্ছানির্বাসনে বাস করতেন; কারণ, তার সেয়ানা-পাগলামির বিরুদ্ধে কিছু জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল।

এদেশে সেকুলার-জাদা বুদ্ধিজীবীরা মা-বাবা মারা গেলে কাঁদে না, অশৌচ পালন করে না, নির্দিষ্ট দিনান্তে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে না---কান্নাকাটি করা তো দূরের কথা। জন্মদাতা-দাত্রীর জন্য তাদের চোখে পানি ঝরে না। কেউ কেউ আবার বলে তারা তো মা-বাবার দৈহিক সুখের ফসল; তাদের জন্য কেন কান্না করবো? তাদের জন্ম না দিলে তো সাংসারিক দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হোত না। কুলাঙ্গারদের কথা শুনুন!

অথচ এরাই আবার কোনও মুসলিম সন্ত্রাসী-জেহাদী মারা গেলে তার জন্য শোকে অভিভূত। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলে। আর মেকী সেকুলার মুসলমান মারা গেলে তো ডাক ছেড়ে কান্না করে। অনেক সময় জানেই না তার পরিচয় কি, কার্যকলাপ কি? দেশ ও সমাজে তার কি প্রতিদান। কিন্তু অনেকে যখন কাঁদছে, সেইসঙ্গে গলা মিলিয়ে একটু কেঁদে নেয়— যদি আখেরে কোনও কাজে লাগে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে অনেকদিন আগের কথা। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা মারা গেছেন। কাশ্মীরে কান্নার রোল উঠেছে। বালবৃদ্ধ পুরুষ-নারী রাস্তার ধারে বসে বসে কাঁদছে। কারও কারও কান্নার হাঁ আকর্ণ বিস্তৃত। সংবাদপত্র তার ছবিও ছেপেছে। সংবাদদাতা লিখেছেন—একটা সাত/আট বছরের ছেলেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে তুই কাঁদছিস কেন? সে কান্না থামিয়ে বলল— বাবা মর গয়া। ছেলেটি জানে না কার বাবা, কিসের বাবা, কেন বাবা। কিন্তু সবাই বাবা বলে কাঁদছে দেখে সেও তাতে সামিল হয়েছে।

তা সেকুলার সারমেয় দলেরও সেই দশা। ইদানীং এদের বাংলায় বলে বুদ্ধিজীবী। আমরা শিল্প-টিল্প তেমন বুঝি না, তবে শিল্পীরা যে কি ধান্দাবাজ গত বছর দুয়েকের মধ্যে তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি। শুধু শিল্পী কেন? কবি, নাট্যকার, চিত্রকর, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক,

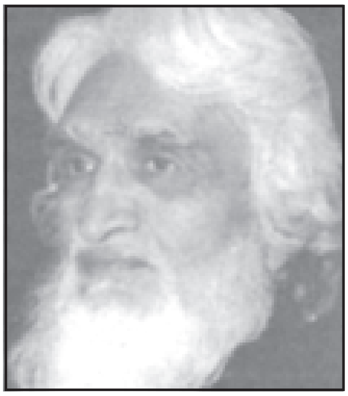

অভিনেতা-অভিনেত্রী--- বহুভোগ্যা, বিগতযৌবনা— সব মধুলোভে অলিসম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে কেমন ভীড় করেছে। এদেরই এক কথায় বলে বুদ্ধিজীবী। যেমন—আলু পটল, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁচকলা, পুঁইশাক, সব আলাদা আলাদা না রেঁধে মাছের নাড়ীভুঁড়ি ও মুড়ো সমেত বড় কড়াইতে ফেলে বড় খুন্তি দিয়ে পিটিয়ে দলা পাকালে হয় ছ্যাঁচড়া তরকারী, তেমনি ধান্দাবাজ শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অধ্যাপক, সাংবাদিক প্রভৃতিরাও নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা মুছে ফেলে বুদ্ধিজীবী নামে এক শিক্ষিত ছ্যাঁচড়ায় পরিণত হয়। তখন জাত-গোত্র-ধর্ম-সংস্কৃতি-দেশপ্রেম-স্বজাতি প্রেম বলে কোনও বস্তু এসব ছ্যাঁচড়াদের মধ্যে দেখা যায় না।

এরাই সরস্বতীর নগ্ন ছবি এঁকে যে কুখ্যাতি অর্জন করেছে, ভারতমাতার নগ্ন ছবি এঁকে শিল্পীর স্বাধীনতার দোহাই দিচ্ছে, সে মকবুল ফিদা হোসেনের মৃত্যুতে সেকুলার ছ্যাঁচড়ারা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। দুষ্টচরিত্র, নষ্টচরিত্র, রূপোজীবীনী, দেহোপজীবীনী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর চালিকাশক্তি, প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক নেতা—কে নয়, সবাই কেঁদে ভাসাচ্ছে —ফিদা হোসেন, ফিদা হোসেন বলে বুক চাপড়াচ্ছে।

এসব রুদালীকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, এদের মায়েদের ল্যাংটা ছবি এঁকে চোখের সামনে ধরলে এরা কি চোখ বুঁজে থাকবে, না মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থেকে শিল্পীর শিল্পকর্মের তারিফ করবে?

বার্সিলোনাই কি সর্বকালের সেরা ক্লাব দল ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্য গ্রহের দল হয়ে উঠেছে বার্সিলোনা। যে স্টাইল ও ফর্মেশনে ফুটবলটা খেলছে পেপ গুয়াদিওয়ালার ছেলেরা তা অনুসরণ করতো দূর অস্ত, অনেক বাঘা বাঘা তাত্ত্বিক ক্লাবকোচ ঠিকমতো অনুধাবনই করতে পারছে না। সারা মাঠ জুড়ে জ্যামিতিক বুনোট তৈরি করে অপূর্ব এক নান্দনিক ও ছন্দবদ্ধ কারুকার্য মেলে ধরছে বার্সিলোনা। অনেকটা পেলে-গ্যারিঞ্চার আমলে ব্রাজিল বা আরও আগে পুসকাস-ককসিস-বসজিকের হাঙ্গেরি যে ঘরানার ফুটবলটা খেলত, সেরকমই এক মিশেল। একই সঙ্গে তুলনায় আসতে পারে সত্তর দশকের হল্যান্ড টিমের কথাও। যোহান ক্রুয়েফ, পল নিসকেন্স, রুডি ক্রলরা এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন খেলাটিকে।

বার্সিলোনা কি সর্বকালের সেরা ক্লাব দল? যে বিক্রম ও শৈলী নিয়ে তারা পরপর ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট জিতে চলেছে তাতে এই প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। এখনই বিশ্বের ইতি-উতি চর্চা শুরু হয়ে গেছে এ ব্যাপারটি নিয়ে। লুসকাস, ডি স্টিকালো, জেন্টোর আমলে স্পেনেরই অপর বিশ্ববন্দিত ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদকেই ফিফা গত একশো বছরের সেরা ক্লাব দলের মর্যাদা দিয়েছে। টানা ৬ বার ইউরোপিয়ান কাপ জিতে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। গোটা বিশ্বে তাদের একদশক রাজত্ব কায়েম ছিল ক্লাব ফুটবলে।

আর রিয়াল মাদ্রিদের অপ্রতিহত জয়রথ থামাতে সক্ষম হয়েছিল ম্যাট বুসবির ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ছ-এর দশকের মাঝপথ থেকে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ ক্লাবটি ইউরোপের সব ক্লাবের আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছিল। জর্জ বেস্ট, ববি চার্লটন, জিওফ হার্স্টরা তখন বিশ্বখ্যাত মিউজিক ব্যান্ড বিটলসের মতোই দুর্নিবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও হালের বার্সিলোনা— এই তিনটি দলের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে কে এগিয়ে? ফুটবল গবেষকরা এই ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত। একদল বলছে রিয়াল মাদ্রিদই সর্বকালের সেরা ক্লাব দল। তাদের যা সাফল্য তা এখনও করায়ত্ত হয়নি বার্সিলোনার। তবে এই টিম যে রিয়াল মাদ্রিদের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারে; যদি টিম অপরিবর্তনীয় থাকে, তা কিন্তু বলে দিচ্ছেন সমস্ত সমালোচকই। ২০০৮ থেকে স্পেনের ফুটবলের জয়যাত্রা শুরু। সে বছর ইউরো কাপ জেতে স্পেন। তার পরের বছর বার্সিলোনা জেতে ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপ ও ওয়ার্ল্ড ক্লাব কাপ। ২০১০-এ স্পেন ইতিহাস সৃষ্টি করে জিতে নেয় ফিফা বিশ্বকাপ। আর এ বছর বার্সিলোনা ফের ইউরোপ সেরা ক্লাবের রাজসিংহাসনে। বলা বাহুল্য, বার্সিলোনার ৬-৭ জন ফুটবলার খেলেন স্পেনের হয়ে। তাই স্পেনের কোচ দেল বাস্কের কোনও চিন্তাই নেই। একই সিস্টেম ও প্যাটার্ন বলবৎ থাকে জাতীয় দলের খেলায়। চমৎকার বোঝাপড়া ও উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা দিয়ে বার্সিলোনার মতো স্পেনের জাতীয় দলকেও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও উতরে দেন জাভি, ইনিয়েস্তা, পিকে, দাভিদ ভিয়ারা। বার্সেলোনা তথা স্পেনের এই সব ফুটবলার এখন হাসতে হাসতে বিশ্ব একাদশ টিমে চলে আসবেন।

সব খেলাতেই এরকম কালজয়ী, চিরন্তন ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যের আধার নিয়ে উঠে আসে এক একটি দল। যেমন হকিতে স্বাধীনতার পূর্ব ও অব্যবহিত পরবর্তী ভারতীয় দল। ধ্যানচাঁদ, রূপসিং, দারা, কেভি সিং 'বাবু', উধম সিং, লেসলি ক্লডিয়াস, বলবীর সিংদের ভারত দুই দশক বিশ্বপর্যায়ের কোনও ম্যাচ হারেনি। কি অলিম্পিয়াড কি শুভেচ্ছা বিদেশ সফরের টেস্ট ম্যাচ বা প্রীতিম্যাচ সব ক্ষেত্রেই গোলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা বিপক্ষ দলকে। তখন ভারতের সঙ্গে খেলে খেলে ইউরোপের দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া পরিণত ও পরিশীলিত হয়ে ওঠার রসদ জোগাড় করে নিয়েছিল। সেই রসদ তার সঙ্গে আরও কিছু বিষয়ের সংমিশ্রণ করে পরে সেইসব দেশই ভারতকে টেক্কা মারতে শুরু করে, যা আজও বলবৎ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন'-এর দশকের বাস্কেটবল টিম সম্পর্কে এমনই কথা প্রযোজ্য। 'ম্যাজিক' জনসন, মাইকেল জর্ডন, শাকিল ও নীলের এন বি এ পুষ্ট আমেরিকা দল একটা 'মিথের' জন্ম দেয়। এই বছর বার্সিলোনা অলিম্পিয়াডে বাস্কেটবলে পেশাদার অ্যামেচারের সীমারেখা মুছে যায়। প্রথম থেকেই কোর্টে ঝড় তুলে আমেরিকা গোটা দুনিয়াকে পদানত করে অনায়াসলব্ধ সোনার রাজমুকুট মাথায় পরে নেয়।

সেই বিজয়রথ আজও চলছে। ২০০৮-এর বেজিং অলিম্পিক ছাড়া প্রতিটি আসরে জয়যুক্ত হয়ে আমেরিকার বাস্কেটবল দল মাথা উঁচু করে ফিরেছে। দীর্ঘকায়, শক্তিশালী দেহ কাঠামো ও উঁচু মাত্রার ক্রীড়াগত দক্ষতা যে দলের মূলধন, তাদের রুখবে কোন গ্রহের দল? ক্রীড়া বিজ্ঞানীরা এধরনের গবেষণা ও বিশ্লেষণ করতে উন্মুখ। আক্রমণ-রক্ষণ থেকে অলকোর্ট পজেশন সব বিভাগেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী এন বি এ খেলা মার্কিন বাস্কেটবলাররা। বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও জনপ্রিয়তায় এভারেস্ট ছুঁয়ে ফেলা মার্কিন এন বি এ লিগ এককথায় মার্কিন চরিত্র ও সামাজিক গরিমারই প্রতিফলিত রূপ। ব্রাজিল, হাঙ্গেরির ফুটবল টিম, ভারতীয় হকি, মার্কিন বাস্কেটবল দলের পাশাপাশি তুলনায় আসতে পারে ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমও। দশ বছর সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্টীমরোলার চালিয়ে গেছে বাকি সব টেস্ট টিমের ওপর।

এইসব কীর্তি-গৌরবে উজ্জ্বল জাতীয় দলের পাশে বার্সিলোনার ক্লাব ফুটবলও যথেষ্ট সংবেদনশীল আবেগ, অনুভূতির সঞ্চার করে। মেসি, জাভি, ইনিয়েস্তাদের খেলা দেখতে বসলে দুনিয়ার পারিপার্শ্বিক সবকিছু ভুলে যায় মানুষ। মেসি এখন বিশ্বের সেরা ফুটবলার। স্কিল, টেকনিক, পাওয়ার সবকিছু মিলিয়েই এক অসাধারণ চরিত্র, যেন পূর্বসূরী মারাদোনার ছায়া! পাশে আছেন স্পেনীয় সুপারস্টারেরা। প্রত্যেকেই এক একজন জিনিয়াস। মাঠের বাইরে ক্ষুরধার গেম-রিডিং ও তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোচ পেপ গুয়াদিওয়ালা। এই দল আধুনিক ফুটবলের ব্যকরণ ও প্রকরণটাই বদলে দিয়েছে। সারা মাঠ জুড়ে পেন্ডুলামের মতো ঘুরছে সব ফুটবলার। অচিন্ত্যনীয় কল্পনাশক্তি ও অতিমাত্রিক স্কিল দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে উঠে আসছে বিপক্ষের ডিফেন্সে, যা দেখে মনে হয় এই বার্সিলোনা যেন স্বপ্নময় এক মায়াবী নন্দন।

শব্দরূপ-৫৮৮ অর্কপ্রবাহ দে

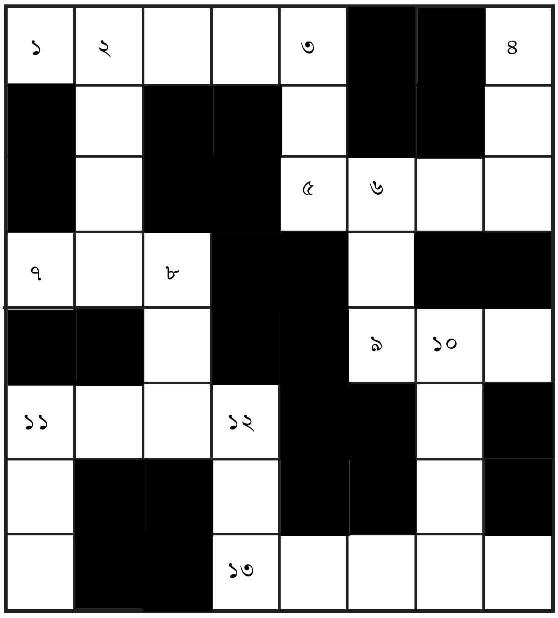

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. কাপড়ের খুঁট বা কোল-আঁচল, আগাগোড়া শক্তি, **৫.** ইনি গান্ধীবুড়ি বলেও পরিচিত, পদবি হাজরা, **৭.** বিশেষণে অতিক্রান্ত, বিগত, অব্যয়ে বাদে, ছাড়া, বিনা, **৯.** শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত অসুর বিশেষ, **১১.** নাটকের চরিত্রাবলীর পরস্পর কথোপকথন, **১৩.** অন্য নামে কোকিল, প্রথম তিনে বাংলার শেষ ঋতু।

উপর-নীচ ঃ ২. বাগ্‌দেবী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, **৩.** সাত্ত্বিক ভাব, মধ্যে ঘৃত, শেষ ঘরে জননী, **৪.** মাতৃদেবী, **৬.** সূর্য, **৮.** এর জুড়ি বাঁয়া, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, **১০.** আমোদপ্রমোদ, **১১.** চাঁদসদাগরের স্ত্রী, **১২.** উৎসব।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

বি	দু	র	ক্ষু	দ			কা
	র্যো			ম			জ
	ধ			কা	দ	স্ব	রী
ব	ন	জ			রা		
		ল			নি	কে	শ
কা	ল	কে	তু			শা	
ণী			র			কে	
ন			গ	গু	কী	শি	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ জুলাই, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা ।। সর্প যজ্ঞ ।। ১১

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের শততম অধিবেশন জেনেভায়

প্রিয়ব্রত দত্ত ॥ আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের ঐতিহাসিক ১০০ তম অধিবেশন সুইজারল্যান্ডের জেনিভাতে গত ৩১ মে থেকে ১৭ জুন, ২০১১ অনুষ্ঠিত হলো। ১৪৫টি দেশের প্রায় ৪৭০ জন প্রতিনিধি ওই অধিবেশনে যোগ দেন।

(বাঁ দিকে) বি এম এসের সর্বভারতীয় সভাপতি সি কে সাজিনারায়ণ ও সম্পাদক বৈজনাথ

ভারত থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রম সংগঠন ও মালিক পক্ষের মোট ৩০ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। শ্রম সংগঠনগুলি থেকে বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বৈজনাথ রায়-এর নেতৃত্বে ৯ জন প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন বি এম এসের সর্বভারতীয় সভাপতি সি কে সাজিনারায়ণ, আই এন টি ইউ সি সভাপতি জি সঞ্জীব রেড্ডী, সহসভাপতি আই এন টি ইউ সি, এন এন অদ্যানথা, শ্রীমতী ববিতা মঞ্জুল ভরদ্বাজ, শ্রীথমনান থমাস, এইচ এম এস, এ কে পদ্মনাভন, সি আই টি ইউ, রাজীব ধিমরি, এ আই সি সি টি ইউ। এছাড়া শ্রম সচিব, ভারত সরকার, পি সি চর্তুবেদী সরকারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন এবং শ্রীরভি উইগ, চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান এম্প্রয়ারস, শিল্পগোষ্ঠীর (মালিক) প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। অধিবেশনে মূলত চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়—

(ক) সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা।

(খ) গৃহস্থালী কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়ন এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষা।

(গ) শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিক প্রশাসন।

(ঘ) স্ট্যান্ডার্ড কমিটি।

এবারের অধিবেশনে 'গৃহস্থালী শ্রমিক' (Domistic Worker) বিষয়টি ছিল মূল আলোচ্য (Theme)। প্রতিটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং শেষে সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ক, গ ও ঘ বিষয়গুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও গৃহস্থালী শ্রমিকদের বিষয়ে ভোটাভুটি হয়। ৪৭০ জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬টি দেশের মালিক পক্ষ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। বৈজনাথ রায় সামাজিক সুরক্ষা কমিটিতে সদস্য নির্বাচিত হন।

বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বৈজনাথ রায় ভারতের শ্রমসংগঠন গুলির পক্ষে ভাষণ দেন।

বিশ্ব শান্তি'র জন্য বি এম এস-এর মূলনীতি মাননীয় দত্তপন্থ ঠেংড়ীজীর ভাবনা— "Worker can Unite the World"-এর কথা শ্রী রায় ব্যাখ্যা করেন। বিষয়টি সম্মেলনে উচ্চ প্রশংসা পায়।

"ভারত ও তার প্রতিবেশী" গোষ্ঠীর বৈঠক পাকিস্তানে আগামী ২৯, ৩০, ৩১ অক্টোবর, ২০১১ হবে বলে স্থির হয়। BRICF গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি— ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা BMS-কে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানান। আরব দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ বি এম এস-এর সঙ্গে আলোচনা করেন ও ইরানে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

Swastika RNI No. 5257/57
11 July - 2011

Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

দাম : ৫.০০ টাকা